তাহ্‌রীর ম্যাগাজিন

বর্ষ ০৩ | সংখ্যা ০২ | রজব ১৪৩৫ | মে ২০১৪ মূল্য : ১২ টাকা

যালিম পিতার যালিম কন্যা শেখ হাসিনা অপহরণ, গুম ও হত্যাকান্ডের মাধ্যমে দেশকে ফেরাউনী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়

খিলাফত রাষ্ট্রের শাসন ও প্রশাসনিক কাঠামো

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমীরগণের পরিচিতি

সচেতন, সাহসী ও নিষ্ঠাবান তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস: www.hizb-ut-tahrir.info

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমীর শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্‌-রাশতা-এর ফেসবুক লিংক: www.facebook.com/ata.abualrashtah

www.khilafat.org

www.facebook.com/PeoplesDemandBD

সূচীপত্র :

দেশে অব্যাহত অপহরণ, গুম ও হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি :

যালিম পিতার যালিম কন্যা শেখ হাসিনা অপহরণ, গুম ও হত্যাকান্ডের মাধ্যমে দেশকে ফেরাউনী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়

পৃষ্ঠা : ০২

সচেতন, সাহসী ও নিষ্ঠাবান তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর লিফলেট :

আপনাদের এবং জনগণের শোষক, আপনাদের এবং জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ; দুর্নীতিগ্রস্ত বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

পৃষ্ঠা : ০৩

নির্বাচিত নিবন্ধ :

খিলাফত রাষ্ট্রের শাসন ও প্রশাসনিক কাঠামো

খলীফা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি শাসন, কর্তৃত্ব এবং শারী'আহ্'র বিধি-বিধান সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতিনিধিত্ব করেন। ইসলাম এটি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, শাসন এবং কর্তৃত্ব থাকবে উম্মাহ্'র অধিকারে। এজন্যই উম্মাহ্ শাসনকার্য পরিচালনা ও তাদের উপর শারী'আহ্'র হুকুম-আহ্‌কাম সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার পক্ষ হতে একজনকে নিযুক্ত করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিটি শারী'আহ্ আইন বাস্তবায়ন করা উম্মাহ্'র জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন...

পৃষ্ঠা : ০৪

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর দ্বিতীয় আমীরের পরিচিতি

তাঁর নাম শাইখ আব্দুল কাদিম বিন ইউসুফ বিন ইউনিস বিন ইব্রাহিম আল শাইখ যাল্লুম এবং তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মনীষী। হিজরী ১৩৪২ অর্থাৎ ১৯২৪ সালে ফিলিস্তিনের আল-খলিল শহরে তাঁর জন্ম। দ্বীন চর্চার জন্য তাঁর পরিবারের অনেক খ্যাতি ছিল...

পৃষ্ঠা : ১০

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বর্তমান আমীরের পরিচিতি

হিজরী ১৪২৪, সফর ১১ বা ১৩ এপ্রিল, ২০০৩ **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর দিওয়ান আল মাযালিমের প্রধান **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আমীরের নাম ঘোষণা করেন। তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত আইনবিদ, মনীষী ও প্রকৌশলী আতা বিন খলিল আবু আল রাশতা আবু ইয়াসিন। আমাদের প্রত্যাশা তাঁর নেতৃত্বেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের বিজয় দান করবেন; দাওয়াহ বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে এবং প্রশাসনিক সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি **হিযব**-এর শাবাবদের (নেতা-কর্মীদের) দক্ষতার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেছেন...

পৃষ্ঠা : ১২

অন্যান্য:

- লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, কানাডা "একমাত্র ইসলামই পারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী নির্যাতন ও শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে" — পৃষ্ঠা : ০৪
- নির্বাচিত প্রবন্ধ : মার্কিনীদের উদার গণতন্ত্র মেকি এবং বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র একটি একক কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্র — পৃষ্ঠা : ০৯
- সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াতে অনুষ্ঠিত "খিলাফাহ্ বাস্তবায়নে আলেমদের ভূমিকা" বিষয়ক সম্মেলনে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় গণমাধ্যম কার্যালয়ের পরিচালক, প্রকৌশলী জনাব ওসমান বাখাস্-এর বক্তব্য — পৃষ্ঠা : ১৩
- অনুবাদ : ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — পৃষ্ঠা : ২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

যালিম পিতার যালিম কন্যা শেখ হাসিনা অপহরণ, গুম ও হত্যাকান্ডের মাধ্যমে দেশকে ফেরাউনী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়

ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকা অপহরণ, গুম ও হত্যাকান্ড বাংলাদেশে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ডজন খানিক গুম ও অপহরণের লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে, যেসবের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপহৃত ব্যক্তিসমূহ লাশ হয়ে ফিরেছে, এবং আরো অনেকেই আছে যাদের খোঁজ এখনো মেলেনি। চাক্ষুষ সাক্ষীর বর্ণনা এবং ঘটনার প্রকৃতি থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এসব ঘটনার পেছনে সাধারণ অপরাধী নয় বরং হাসিনা সরকারের গুপ্তঘাতক বাহিনীরই হাত রয়েছে, কারণ এক দিকে অপহরণকারীরা কোন মুক্তিপণ দাবি করছেনা, আর অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসমূহ অপরাধীদের কোন ভাবেই চিহ্নিত করতে পারছেনা যা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

হাসিনা সরকার ভাল করেই জানে যে, তার কুকর্ম দেশে জনঅসন্তোষের সৃষ্টি করছে এবং গুম অপহরণ ছাড়াও সীমাহীন দুর্নীতি, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের বেপরোয়া সন্ত্রাস, সংখ্যালঘু নির্যাতন, ভারতের হাতে সুন্দরবনকে তুলে দেয়া, ভারতের নদী আগ্রাসনের বিপরীতে দাসসুলভ আচরণ ইত্যাদি ইতিমধ্যেই এই অত্যাচারী সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তাই জনগণ রাজপথে নেমে আসার আগেই ভেবেচিন্তে হাসিনা সরকার এই গুম-হত্যার পরিস্থিতি তৈরি করছে, বাংলাদেশকে একটি "ফেরাউনী রাষ্ট্রে" পরিণত করার পাঁয়তারা করছে যাতে জনমনে ভয়, আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়।

হিযবুত তাহ্‌রীর, যালিম পিতার যালিম কন্যা শেখ হাসিনাকে ফেরাউনের অন্তিম পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। জনগণের বিরুদ্ধে তার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর, জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে, যালিম হাসিনার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন। হাসিনাকে অপসারণ এবং আওয়ামী-বিএনপির মতো যালিম তৈরিকারী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন। একমাত্র খিলাফতই পারবে জনগণকে আওয়ামী-বিএনপির উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করতে এবং হাসিনার সকল অপকর্মের শাস্তি নিশ্চিত করতে।

আর যালিম শাসকদের ভয় করবেন না, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকেই ভয় পাবেন যিনি একমাত্র ভয় পাওয়ার অধিকারী। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

(إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (آل عمران: 175)

"এই হল শয়তান, যে তোমাদেরকে তার আউলিয়াদের (বন্ধু, আনুসারী) ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর না, আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।"
[সূরা আলি ইমরান : ১৭৫]

০৩ মে, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
০৪ রজব, ১৪৩৫ হিজরী

...০৪ পৃষ্ঠার পর থেকে

লিফলেট: সচেতন, সাহসী ও নিষ্ঠাবান তরুণদের...

- দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে তেল, গ্যাস এবং কয়লার মতো বিভিন্ন গণমালিকানাধীন সম্পদকে বেসরকারী এবং বিদেশী মালিকানার হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে এসব সম্পদকে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করবে এবং দ্রুত ভারী শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলবে।
- মুসলিম উম্মাহ্‌'কে ঐক্যবদ্ধ করবে, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলবে এবং মুসলিমদেরকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হতে মুক্ত করবে।

৫. যালিম হাসিনা এবং আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে খিলাফত প্রতিষ্ঠায়, সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট দাবি জানাতে হবে।

ইনশা'আল্লাহ্‌, এই মহান সংগ্রামের জন্য কেয়ামতের দিন আপনারা আপনাদের পুরস্কার পাবেন, যেদিন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"হাশরের দিন সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তাঁর ছায়া দ্বারা ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তারা হচ্ছে ... একজন যুবক যে আল্লাহ্‌'র ইবাদতের মধ্যে বেড়ে উঠে...।"

১৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৫ হিজরী
১৪ই মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

সচেতন, সাহসী ও নিষ্ঠাবান তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান

আপনাদের এবং জনগণের শোষক, আপনাদের এবং জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ; দুর্নীতিগ্রস্ত বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)) (آل عمران: 110)

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে, এবং আল্লাহ্'র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।"
[সূরা আলি-ইমরান : ১১০]

শত শত বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ্ খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিল্প, সামরিকসহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বশীল এক শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মুসলিম তরুণরাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই উম্মাহ্'র ইতিহাস মুহাম্মদ আল-ফাতেহ্-এর মতো তরুণদের গৌরব অর্জনের ইতিহাস দ্বারা পরিপূর্ণ। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী বাইজেনটাইনদের (রোমানদের) পরাজিত করে কন্সটান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) জয় করেন এবং একে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত করেন। তারিক বিন যিয়াদ মাত্র ১৭ বছর বয়সে স্পেন জয় করেন এবং একই বয়সে মুহাম্মদ বিন কাশিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ভারত উপমহাদেশে ইসলামের শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বখতিয়ার খিলজী, যার আগমণে রাজা লক্ষণ সেন যুদ্ধ না করেই পালিয়েছিল, এই বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

হে সচেতন, সাহসী ও নিষ্ঠাবান তরুণরা!

এটাই আপনাদের প্রকৃত ইতিহাস, হে মুসলিম তরুণরা! আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সর্ববৃহৎ মানব পতাকা তৈরির সস্তা গর্ববোধ নয়। বরং আপনারা মানব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র গঠনে সম্মানজনক ভূমিকা পালন করেছেন। আপনারা যালিম শাসকদের সিংহাসন কাঁপিয়েছেন, একের পর এক ভূমিতে তাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেখানকার মজলুম জনগণকে মুক্ত করেছেন এবং দুর্নীতি, যুলুম ও নির্যাতন দূর করে ইসলামের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আপনাদের বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, হে তরুণ সমাজ! সুদীর্ঘ ৪৩ বছর পর, এখনও আওয়ামী-বিএনপি শাসকেরা আপনাদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা জীর্ণ দশায় আর বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থা আপনাদের পিতা-মাতার কষ্টার্জিত আয়কে শুষে নিচ্ছে। ৪৩ বছর পরও আওয়ামী-বিএনপি শাসকেরা আপনাদের জন্য সন্তোষজনক চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারেনি। জীবনধারণের জন্য এখনও আপনাদেরকে যেখানে সেখানে ধর্ণা দিতে হয়, ভিক্ষুকের মতো এ্যাম্বাসীগুলোর দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। অন্যদিকে তারা জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণজাগরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন অন্তঃসারশূণ্য ও প্রতারণাপূর্ণ শ্লোগানের নামে আপনাদেরকে বিভিন্ন সস্তা সংগ্রামে মোহাচ্ছন্ন ও ব্যস্ত রেখে বিভক্ত, শোষণ এবং তাদের নোংরা রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তারা বিভিন্ন দেশী-বিদেশী অর্থলিপ্সু পুঁজিবাদী কোম্পানী, যেমনঃ মোবাইল অপারেটরগুলোকে, লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়ে তরুণদের টাকা কামানোর মেশিন বানিয়ে পকেট শুষে নেয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। তাছাড়াও এই শাসকেরা পশ্চিমা সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং ড্রাগ্‌স, ইত্যাদির নেশায় আপনাদের ডুবিয়ে রাখে যেন আপনারা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করেন এবং তারা তাদের শোষণ এবং লুটপাট চালিয়ে যেতে পারে।

যেখানে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অধীনে আপনাদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নাই, সেখানে কিভাবে আপনারা ভূখন্ড জয়, ইসলামের ন্যায়বিচারের প্রসার কিংবা পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারে নির্যাতিত, আক্রান্ত, ধর্ষিত, জীবন্ত দগ্ধ এবং নিহত বোন ও ভাইদের রক্ষা করবেন! আর দূরবর্তী সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (CAR)-এর কথাতো বাদই দিলাম। এটাই আপনাদের বাস্তবতা, হে মুসলিম তরুণরা!

আর আপনারা এদেশের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন। জনগণ এবং নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের জন্য যালিম হাসিনা দেশকে জাহান্নামে পরিণত করেছে। জনগণ এবং নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের গ্রেফতার-গুম এখন সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। যালিম পিতার এই যালিম কন্যা ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতেই সর্বত্র ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে। সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন গোষ্ঠী উন্মত্তভাবে ইসলামকে আক্রমণ করছে। আওয়ামী-বিএনপি জোটের সংঘাতের রাজনীতির ফলে বাংলাদেশ আজ লাশ ও ধ্বংসস্তুপের জনপদ ছাড়া আর কিছুই না। বিদেশী শক্তিগুলো তথা মার্কিন-বৃটেন-ইইউ-ভারত-চীন-এর স্বার্থে তারা জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বিদেশী কোম্পানীগুলোর কাছে তারা দেশের সম্পদকে তুলে দিচ্ছে এবং এক্ষেত্রে তারা সমানে সমান। দুর্নীতিতে তারা একে অপরকে ছাড়িয়ে গেছে ... পদ্মা সেতু, হলমার্ক, রেলের কালোবিড়াল ... এই তালিকা সীমাহীন। আর এসবই ঘটছে যখন তারা খোদ রাজধানী ঢাকাতেই রান্নাঘরে গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না!

হে সচেতন, সাহসী ও নিষ্ঠাবান তরুণরা!

হিযবুত তাহ্‌রীর, আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে, নিজেদের এবং দেশের জনগণকে মুক্ত করতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শুধুমাত্র ফেসবুক, টুইটার এবং ব্লগগুলোতে রাজনীতিবিদদের বিদ্রুপ করে হতাশা এবং ক্ষোভ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। দেশকে যালিম হাসিনা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্ত করতে এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে কার্যকর রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে। ইসলামী শাসনই আপনাদের ও জনগণের বিষয়াবলীর সঠিক দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করবে। একমাত্র ইসলামী শাসনই মুসলিম উম্মাহ্‌'কে বিশ্বে নেতৃত্বশীল জাতি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। আপনারা আরব দেশগুলোতে আপনাদের ভাইদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন, তারা রাজপথে নেমেছে এবং তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, "তরুণরা যালিম শাসকের পতন চায়" এবং "এটা আল্লাহ্‌'র জন্য, এটা আল্লাহ্‌'র জন্য।"

ইব্রাহীম (আঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করুন, যিনি সোচ্চার হয়েছিলেন এবং নির্ভীকভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন,

((وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ))

"এবং আল্লাহ্‌'র কসম, আমি তোমাদের দেবতাগুলোর পতন নিশ্চিত করবো..." [সূরা আল-আম্বিয়া' : ৫৭]। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সমাজকে আল্লাহ্‌'র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তা করেছিলেন, সম্পূর্ণ নির্ভয়ে, যখন তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ আর নমরুদ ছিল হাসিনার চেয়ে বড় যালিম শাসক –

((قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ))

"তারা বলল: 'আমরা এক যুবককে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলে ডাকা হয়'।" [সূরা আল-আম্বিয়া' : ৬০]

হে মুসলিম তরুণরা!

হিযবুত তাহ্‌রীর, আপনাদের সামনে নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের সংগ্রামে আত্মনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে:

১. ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের প্রতারণাপূর্ণ আহ্বানকে প্রতিহত করতে হবে এবং একমাত্র সঠিক আক্বীদা- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌"-এর ভিত্তিতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান করতে হবে।

২. দুর্নীতিগ্রস্ত কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আওয়ামী-বিএনপি জোটের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৩. যালিম হাসিনা এবং আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে দেশে ইসলামী শাসন তথা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে হবে।

৪. জনগণের মধ্যে খিলাফতের ব্যাপারে নিম্নোক্ত শক্ত জনমত তৈরিতে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে:

- খিলাফতই দেশের সকল নারী-পুরুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নিরাপত্তাসহ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করবে; এবং উন্নত জীবন-যাপনের সুযোগ করে দিবে।
- অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা দিবে এবং কোনরকম বৈষম্য ছাড়া তারা মুসলিমদের মতো সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।
- ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও জনগণের সম্পদের লুটপাট বন্ধ করবে এবং সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে সামগ্রিক সম্পদের বৈষম্যের অবসান ঘটাবে।

...০২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ধারাবাহিক নির্বাচিত নিবন্ধ: গত সংখ্যার পর থেকে

খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

(শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা)

সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতেহ (শাসনকাল : ১৪৫১-১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ)

খলীফা

খলীফা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি শাসন, কর্তৃত্ব এবং শারী'আহ্‌'র বিধি-বিধান সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্‌'র প্রতিনিধিত্ব করেন। ইসলাম এটি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, শাসন এবং কর্তৃত্ব থাকবে উম্মাহ্‌'র অধিকারে। এজন্যই উম্মাহ্‌ শাসনকার্য পরিচালনা ও তাদের উপর শারী'আহ্‌'র হুকুম-আহ্‌কাম সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার পক্ষ হতে একজনকে নিযুক্ত করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিটি শারী'আহ্‌ আইন বাস্তবায়ন করা উম্মাহ্‌'র জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যেহেতু খলীফা মুসলিমদের দ্বারা নির্বাচিত হন, সেহেতু স্বভাবতই তাকে শাসন, কর্তৃত্ব ও শারী'আহ্‌ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উম্মাহ্‌'র প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং, কোন ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা হতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি উম্মাহ্‌'র কাছ থেকে বাই'আত প্রাপ্ত হবেন; কারণ, মূলতঃ শাসন, কর্তৃত্ব ও শারী'আহ্‌ আইনসমূহ বাস্তবায়ন করা উম্মাহ্‌'র এখতিয়ারে। প্রকৃতঅর্থে, একজন

ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে বাই'আত দিয়েই মুসলিম উম্মাহ্‌ কার্যকরীভাবে তাকে উম্মাহ্‌'র প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করে। আর, এই বাই'আতের মাধ্যমেই তার উপর খিলাফত রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, খলীফাকে (উম্মাহ্‌'র উপর) কর্তৃত্বশীল করা হয় এবং সর্বোপরি, উম্মাহ্‌কে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করা হয়।

বস্তুতঃ যিনি মুসলিমদের শাসন করবেন, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা হতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না উম্মাহ্‌'র মধ্য হতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ (আহ্‌লুল হাল ওয়াল আকদ্‌) স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে বাই'আত প্রদান করেন। খলীফা হিসেবে নিয়োগ পাবার জন্য তাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে এবং তারপর তাকে শারী'আহ্‌ বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

খলীফা নিয়োগের শর্তাবলী

খলীফা পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য একজন ব্যক্তিকে সাতটি অবশ্য পূরণীয় চুক্তিবদ্ধ শর্ত পূরণ করতে হবে। এদের মধ্যে কোন একটির ব্যাত্যয় ঘটলে, খলীফার পদে তার নিয়োগ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

অবশ্য পূরণীয় শর্ত সমূহ:

১. খলীফা অবশ্যই মুসলিম হবেন।

একজন কাফির বা অবিশ্বাসীকে কোন অবস্থাতেই বাই'আত দেয়া যাবে না। কোন কাফির যদি উম্মাহ্‌'র নেতা নির্বাচিত হয়ও তবে মুসলিমদের তার আনুগত্য করা শারী'আহ্‌ সম্মত হবে না। কারণ, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন :

"আর মুসলিমদের উপর কাফেরদের কর্তৃত্ব করার কোন পথই আল্লাহ্‌ অবশিষ্ট রাখেননি।" [সূরা আন-নিসা : ১৪১]

...যেহেতু খলীফা মুসলিমদের দ্বারা নির্বাচিত হন, সেহেতু স্বভাবতই তাকে শাসন, কর্তৃত্ব ও শারী'আহ্‌ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উম্মাহ্‌'র প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং, কোন ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা হতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি উম্মাহ্‌'র কাছ থেকে বাই'আত প্রাপ্ত হবেন...

একজন শাসক যাদেরকে শাসন করেন, পদাধিকার বলে তিনি তাদের উপর কর্তৃত্বশালী হন। উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত **'লান'** (কক্ষণো না) শব্দটি দিয়ে মুসলিমদের উপর কাফিরদের যে কোন প্রকার কর্তৃত্ব করবার ব্যাপারটি সর্বোতোভাবে নিষিদ্ধ (catergorical prohibition) ঘোষণা করা হয়েছে। মূলতঃ এ আয়াতের মাধ্যমেই কাফিরদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

আবার, অন্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যিনি মুসলিমদের বিষয়াদি দেখাশুনার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবেন তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"হে ঈমানদারগণ; তোমরা আল্লাহ্‌'র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল (উলীল আমর) তাদের।" [সূরা আন-নিসা : ৫৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

"তারা যখনই কোন প্রকার জননিরাপত্তা সংক্রান্ত কিংবা ভীতিকর খবর শুনতে পায়, তখনি তা সর্বত্র প্রচার করে দেয় অথচ তারা যদি তা রাসূল ও তাদের উপর কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের (উলীল আমর) কাছে পৌছে দিত।" [সূরা আন-নিসা : ৮৩]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে 'উলীল আমর' শব্দটি সব সময় মুসলিমদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে, কখনোই অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং, এ আয়াতগুলো থেকেও প্রমাণিত হয় যে যারা মুসলিমদের উপর কর্তৃত্বশীল থাকবেন তাদেরকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। যেহেতু খলীফা হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল পদ এবং তিনিই অন্যান্যদের কর্তৃত্বশীল পদে নিযুক্ত করবেন, যেমন: তার সহকারীগণ, ওয়ালী, আমীল প্রমুখ, সেহেতু তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।

২. খলীফাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে।

খলীফাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে, কোন নারীকে খলীফা নিযুক্ত করা যাবে না। বুখারী থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) যখন শুনলেন পারস্যের জনগণ কিসরার কন্যাকে তাদের রাণী হিসেবে নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি (সাঃ) বললেন,

"যারা নারীদেরকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করে তারা কখনওই সফল হবে না।" (সহীহ্‌ বুখারী, হাদীস নং-৪৪২৫)

উপরোক্ত হাদীসে নারীদের শাসক হিসাবে নিযুক্ত করার সাথে 'ব্যর্থতা' শব্দটি যুক্ত করে মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ হাদীসে যারা নারীদের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করবে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিরস্কারের মাধ্যমে এ হাদীসটি আমাদের এমন একটি নির্দেশ দিচ্ছে যা অকাট্য। যার অর্থ, নারীদের শাসক হিসাবে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ।

আবার, হাদীসের ভাষাটি এমনভাবে এসেছে যে, এখানে যারা তাদের বিষয়াদি দেখাশুনার জন্য নারীদের শাসক হিসাবে নিযুক্ত করবে তাদের সফলতাকে সরাসরি অস্বীকার করেও বিষয়টির অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং, এ কারণেও এ নিষেধাজ্ঞাটি অকাট্য (Decisive) বলে গণ্য হবে; অর্থাৎ, এদিক থেকেও একজন নারীকে শাসক হিসেবে নিয়োগ দান করা নিষিদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে। শুধু তাই নয়, নারীদের শাসন সংক্রান্ত যে কোন পদ অলংকৃত করা, সেটি খলীফা কিংবা ওয়ালী বা আমিল, যাই হোক না কেন তা নিষিদ্ধ বলেই বিবেচিত হবে। এর কারণ হচ্ছে, হাদীসের বিষয়বস্তু কিস্‌রার কন্যার রাণী (শাসক) হিসাবে নিয়োগ দেবার সাথে সম্পর্কিত, যা কিনা সরাসরি শাসন-কর্তৃত্বের সাথে জড়িত। এখানে হাদীসের বিষয়বস্তু কিস্‌রার কন্যা হিসাবে তার মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত নয়। আবার হাদীসটি অর্থের দিক থেকে 'আম (সাধারণ) নয়; অর্থাৎ, এক্ষেত্রে বিচারিক কাজে নিযুক্ত হওয়া, শূরা কাউন্সিলের সদস্য হওয়া, শাসককে জবাবদিহি করা কিংবা শাসক নির্বাচন করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত হবে না। বরং, এসবই নারীদের জন্য বৈধ, যা পরবর্তীতে নির্ধারিত অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হবে।

৩. খলীফাকে অবশ্যই বালেগ হতে হবে।

শিশুকাল অতিক্রম করে স্বাবালকত্ব অর্জন করার পূর্বে অর্থাৎ, নাবালেগ ব্যক্তিকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবু দাউদ, আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন:

“জবাবদিহিতা তিন ব্যক্তির জন্য নয়: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জেগে উঠে, বালক যতক্ষণ না পরিণত হয় এবং উম্মাদ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে মানসিকভাবে সুস্থ হয়।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৯৮)

এছাড়া, আলী (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন :

“তিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছুই লেখা হয় না: উম্মাদ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জেগে উঠে এবং নাবালেগ যতক্ষণ না সে বালেগ হয়।”

সুলতান আব্দুল হামিদ-২ (শাসনকাল : ১৮৭৬-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান আব্দুল মজিদ-২ (শাসনকাল : ১৯২২-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)

অর্থাৎ, যার উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে তার কাজের জন্য দায়ী হবে না। শারী'আহ্ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কাজের জন্য তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হবে না। এজন্য তাকে খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করা কিংবা, শাসনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কোন পদে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। কারণ, নাবালেগ হিসাবে সে তার কোন কাজের জন্য দায়ী নয়। যে ব্যক্তি নিজের কর্মকান্ডের জন্য দায়িত্বশীল নয় তাকে খলীফা পদেও নিযুক্ত করা যাবে না। এ ব্যাপারে আরও দলিল পাওয়া যায় বুখারীর কাছ থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন আবু আকীল জাহরা ইবনে মা'বাদ থেকে; তিনি বর্ণনা করেছেন তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইবনে হিশাম থেকে যিনি রাসূল (সাঃ) এর সময় জীবিত ছিলেন। ইবনে হিশামের মা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহ্'র রাসূল! তাঁর কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করুন।' তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, **‘সে তো ছোট’**। অতঃপর তিনি (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে হিশামের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৭২১০)

সুতরাং, হুকুম শারী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে, নাবালেগের বাই'আত যেহেতু গ্রহণযোগ্য নয় এবং নাবালেগ ব্যক্তি খলীফাকে বাই'আত দিতে সক্ষম নয়, সেহেতু তার নিজের পক্ষে খলীফা হওয়াও সম্ভবপর নয়।

৪. খলীফাকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে।

উম্মাদ বা অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে নিয়োগ দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

“তিন ব্যক্তির আমল নামায় কিছুই লেখা হয় না: উম্মাদ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়...”। এ হাদীসের মাধ্যমেই এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত জবাবদিহিতার আওতায় আসবে না যতক্ষণ সে মানসিকভাবে সুস্থ হয়। কারণ, মানসিক সুস্থতা যে কোন দায়িত্ব পালন করার পূর্বশর্ত। খলীফা শারী'আহ্ আইনকে কার্যকর করেন এবং সেইসাথে, শারী'আহ্ প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। সে কারণে একজন অপ্রকৃতস্থ খলীফা থাকা বৈধ নয়। কারণ, একজন অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি নিজের কাজের ব্যাপারেই দায়িত্বশীল নয়, সুতরাং বৃহত্তর যুক্তিতে (by greater reason) সে ব্যক্তি কিভাবে উম্মাহ্'র ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে?

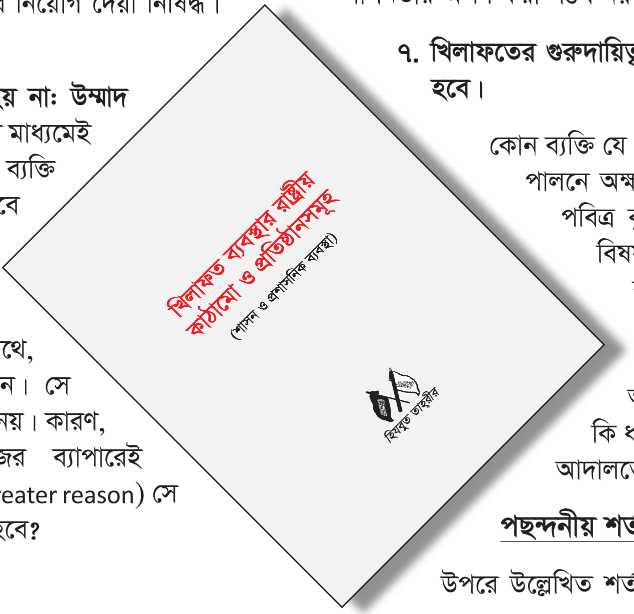

৫. খলীফা ন্যায় বিচারক হবেন।

কোন ফাসিক ব্যক্তি – যে নির্ভরযোগ্য নয় সে খলীফা হতে পারবে না। সত্যনিষ্ঠতা ও দৃঢ় নৈতিক গুণাবলী খলীফা হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত ও এ দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি অবশ্যই সৎ হয়। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন :

“আর এমন দু'জন লোককে সাক্ষী বানাবে যারা তোমাদের মাঝে সত্যনিষ্ঠ হবে।” [সূরা আত-তালাক : ২]

যেহেতু সাক্ষ্যদানকারীদের সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, সেহেতু যিনি ঐসব সাক্ষ্য দানকারীদের উপর কর্তৃত্ব করবেন এবং যিনি সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন, বৃহত্তর যুক্তিতে (By greater reason) তাকে অবশ্যই সৎ হতে হবে।

৬. খলীফা অবশ্যই আযাদ বা মুক্ত মানুষ হতে হবে।

যেহেতু একজন ক্রীতদাস সম্পূর্ণভাবে তার প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সে নিজেই তার নিজের ব্যাপারে কোনরকম সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম, সেহেতু তার পক্ষে জনগণের বিষয়াবলী দেখাশুনা করা কিংবা তার উপর তাদের শাসনভার অর্পণ করা সম্ভব নয়।

৭. খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনে খলীফাকে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে।

কোন ব্যক্তি যে কোন কারণেই হোক না কেন, যদি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, তবে বাই'আতের চুক্তি অনুসারে পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী সে মানুষের বিষয়াদি দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে পারবে না। কারণ, উম্মাহ্'র বিষয়াদি দেখাশুনা করার জন্যই খলীফাকে বাই'আত দেয়া হয়। খলীফার দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতা আছে কিনা কিংবা অযোগ্যতা থাকলে তা কি ধরনের, তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব মাযালিম আদালতের (The Court of Unjust Acts)।

পছন্দনীয় শর্তাবলী:

উপরে উল্লেখিত শর্তাবলী একজন খলীফা নিযুক্ত হবার জন্য

আবশ্যিক। এ সাতটি বাদে বাকী কোন শর্তই খলীফা নিযুক্ত হবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়া, কিছু শর্তাবলী রয়েছে যেগুলো সহীহ্ দলিল প্রমাণের মাধ্যমে যদি জরুরী প্রমাণিত হয় তাহলে এগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে সেগুলো হবে পছন্দনীয় শর্তাবলী। যদি কোন নির্দেশ অকাট্য (Decisive) বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সেটাকে আবশ্যিক শর্তাবলীর আওতায় নেয়া হবে। আর যদি দলিলের ভিত্তিতে সেটি অকাট্য বা চূড়ান্ত (Decisive) বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে সে শর্তটি পছন্দনীয় বলে পরিগণিত হবে। এখন পর্যন্ত উল্লেখিত সাতটি আবশ্যিক শর্তাবলী ব্যতীত আর কোন গুণাবলী আবশ্যিক বলে প্রমাণিত হয়নি। সে কারণে এই সাতটিই খলীফা নিয়োগের জন্য আবশ্যিক শর্তাবলী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর, সহীহ্ দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত বাকী শর্তাবলী শুধুমাত্র পছন্দনীয় শর্তাবলী বলেই বিবেচিত হবে। যেমন: খলীফাকে কুরাই'শ বংশোদ্ভূত, মুজতাহিদ কিংবা অস্ত্র চালনায় পারদর্শী হতে হবে ইত্যাদি। তবে, এগুলোর কোনটিই আবশ্যিক হিসাবে বিবেচনা করার মতো অকাট্য দলিল নেই।

খলীফা নিয়োগ করার প্রক্রিয়া

শারী'আহ্ যখন উম্মাহ্'র উপর একজন খলীফা নিয়োগ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, একইসাথে, শারী'আহ্ খলীফা নিয়োগ করার পদ্ধতিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ পদ্ধতি আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। যে সমস্ত মুসলিম খলীফাকে বাই'আত দিবে তাদের অবশ্যই সে সময়ে খিলাফত রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। আর, যদি পরিস্থিতি এরকম হয় যে, যখন কোন খিলাফত রাষ্ট্র নেই, তখন সে অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উপরই বাই'আত দেবার দায়িত্ব বর্তাবে যেখানে খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।

> *"...'আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন।' তাঁরা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনি আমাদের কী করতে আদেশ করেন? তিনি (সাঃ) বললেন, 'তোমরা একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে'..."*
> *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩৪৫৫)*

বাই'আত যে খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি তা প্রমাণিত হয়, রাসূল (সাঃ) কে মুসলিমদের বাই'আত দেবার ঘটনা ও ইমামকে বাই'আত দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ থেকে। তৎকালীন মুসলিমরা রাসূল (সাঃ) কে নবী হিসাবে বাই'আত দেয়নি; বরং শাসক হিসাবে বাই'আত দিয়েছিল। কারণ, তাদের এ বাই'আত বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত ছিল না, বরঞ্চ তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত ছিল। সুতরাং, রাসূল (সাঃ) কে নবী বা রাসূল হিসেবে বাই'আত দেয়া হয়নি বরং শাসক হিসেবেই বাই'আত দেয়া হয়েছিল। কারণ, নবুয়্যতকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি মূলতঃ বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত এবং এখানে বাই'আতের প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, আল্লাহ্'র রাসূলকে বাই'আত দেবার বিষয়টি তাকে শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া বলেই বিবেচিত হবে।

পবিত্র কুর'আন ও হাদীসেও বাই'আতের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"হে নবী ! তোমার নিকট মুমিন স্ত্রী লোকেরা যদি একথার উপর বাই'আত করবার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্'র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, আপন গর্ভজাত জারজ সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং কোন ভাল কাজের ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তবে তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর।" [সূরা মুমতাহিনা : ১২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"হে নবী! যেসব লোক তোমার নিকট বাই'আত গ্রহণ করেছিল তারা আসলে আল্লাহ্'র নিকট বাই'আত করছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহ্'র হাত ছিল।" [সূরা আল ফাত্হ : ১০]

বুখারী থেকে বর্ণিত হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা.) বর্ণনা করেন,

"আমরা রাসূল (সাঃ) এর নিকট সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় শ্রবন ও আনুগত্য করার শপথ নিয়েছি। একথার উপরও শপথ নিয়েছি যে, আমরা উলূল আমর (শাসন কর্তৃত্বশীল)-এর সাথে বিবাদ করবনা। আমরা এই মর্মেও শপথ নিয়েছি যে, হকের জন্য উঠে দাঁড়াবো কিংবা হক কথা বলব যে অবস্থায়ই থাকি না কেন। আর, আল্লাহ্'র কাজের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবো না।" (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭০৫৪; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-৪৭৪৮)

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্'র রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে,

"যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বাই'আত প্রদান করল, সে যেন তাকে নিজ হাতের কর্তৃত্ব ও স্বীয় অন্তরের ফল (অর্থাৎ সব কিছু) দিয়ে দিল। এরপর তার উচিৎ উক্ত ইমামের আনুগত্য করা। যদি অন্য কেউ এসে (প্রথম নিযুক্ত) খলীফার সাথে (ক্ষমতার ব্যাপারে) বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-১০)

এছাড়াও মুসলিম বর্ণনা করেন আবু সাইদ খুদ্‌রী (রা.) রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন:

"যদি দু'জন খলীফাকে বাই'আত দেয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয়জনকে হত্যা কর।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫৩)

আবু হাজিমের বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম আরও বর্ণনা করেন যে, আমি আবু হুরায়রার সাথে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"'বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন।' তাঁরা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'তখন আপনি আমাদের কী করতে আদেশ করেন?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তোমরা একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন'।" (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩৪৫৫)

উপরোক্ত দলিল সমূহ এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ্ অনুযায়ী খলীফা নিয়োগ করার প্রক্রিয়া হল বাই'আত। সকল সাহাবী (রা.) এটি জানতেন এবং তাদের জীবনে তা কার্যকর করেছিলেন। সুতরাং, খোলাফায়ে রাশেদীনদের কেন বাই'আত দেয়া হয়েছিল, এ সমস্ত দলিল-প্রমাণ থেকে তা পরিষ্কার।

(চলবে...)

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, কানাডা

একমাত্র ইসলামই পারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী নির্যাতন ও শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে

এটা সবার কাছে পরিষ্কার যে বর্তমানে মুসলিম নারীরা ইসলামের প্রতি আক্রমণের ফল ভোগ করছে। পশ্চিমা পুঁজিবাদীরা ইসলামে নারী সংক্রান্ত নীতির প্রতি নগ্ন আক্রমণ ও হেয় প্রতিপন্ন করার কোন চেষ্টাই বাদ রাখেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্যাতিত মুসলিম নারীদের স্বাধীনতার নামে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদে বাধা দেয়া হচ্ছে। জনসমক্ষে অর্ধ-নগ্ন থাকতে পারাই হচ্ছে পশ্চিমাদের নির্ধারিত নারী মুক্তির সংজ্ঞা। তাই পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখা যায় নারী স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের আহ্বান বলতে আসলে কী বোঝায়, এ আহ্বান নারীদের শোষণ করার আহ্বান ব্যতীত আর কিছু নয়। সকলের কাছেই স্পষ্ট নগ্নতা বিষয়টি শুধুই নারীকেন্দ্রিক আর শুধু নারীরাই এই আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। এই আহ্বান নারীকে যৌন লালসার বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে ও তাকে পুরুষের চোখের খোরাক ও ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে।

বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি এই সস্তা আহ্বানের নেপথ্য কারণ স্পষ্ট যখন আমরা দেখি আমাদের বোনদের শ্রম শোষিত হচ্ছে পুঁজিপতিদের স্বার্থে, যেখানে তাদের পরিবার ও ভবিষ্যত প্রজন্ম তথা সন্তানরা হচ্ছে বঞ্চিত। জাকার্তার (ইন্দোনেশিয়া) কারখানাগুলোতে ৯০% এর বেশি শ্রমিক নারী, যাদের ৯০% তাদের সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ানোর অধিকার পায় না। ফলে তাদের সন্তানরা অপুষ্টিতে ভোগে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস খাতে কর্মজীবিদের শতকরা ৮০ ভাগই নারী; এই খাতে বাংলাদেশের আয় বার্ষিক ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জীবন ধারণের লক্ষ্যে ন্যুনতম চাহিদা পূরণের জন্যে এই নারীরা মানবেতর পরিবেশে কাজ করে। অনিরাপদ কর্মস্থলের বিষয়টি জনসমক্ষে আসে সম্প্রতি যখন রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ১০০০ এর বেশি শ্রমিক মারা যায়। এটাই কি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন যা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আমাদের বোনদের উপহার দিচ্ছে? তারা কি শুধু শালীনতা থেকে মুক্তি দেয়, অর্থনৈতিক দৈন্যতা থেকে নয়?

চরম হতাশাজনক এই পরিস্থিতি চলছে আমাদের মুসলিম শাসকদের আশীর্বাদে ও পূর্ণ সহযোগিতায়। এই শাসকরা পশ্চিমা প্রভুদের কথায়

নৃত্য করে এবং উম্মাহ্‌'কে বিক্রি করে তাদের কাছে যারা সর্বোচ্চ দর হাকায়। যদিও এই ব্যবস্থার পেছনে রয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণী, তারপরও এটা বলতেই হয় যে মুসলিম শাসকরা সামান্য কমিশনের বিনিময়ে আমাদের ভাই-বোনদের উপর বিদেশী কোম্পানী কর্তৃক নির্লজ্জ দাসত্ব ও শোষণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুক্তবাজার অর্থনীতি আধুনিক সময়ের মুসলিম ভূ-খন্ডে নারীদের দাসত্ব-বাজার তৈরি করেছে যেখানে ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের বোনেরা প্রায় বিনা মূল্যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই ট্রাজেডির অবসান সম্ভব শুধুমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সাথে অর্থনৈতিক চুক্তি ছিন্ন করবে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নারীদের প্রকৃতিগত ও বাস্তব দায়িত্ব ফিরিয়ে দেবে। ইসলামী সমাজের ভবিষ্যত প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নারীরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে, শাসককে জবাবদিহি করবে ও ইসলাম প্রচারে অংশ নিবে। উম্মাহ্‌'র প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করা নারীদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ইসলামের ইতিহাস সমৃদ্ধ। যেমন:

- নুসাইবা বিনতে কা'ব (রা.) ও আসমা বিনতে আমর (রা.) আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। এই শপথ অনুষ্ঠানটি রাসূল (সাঃ) এর মদিনা রাষ্ট্র বাস্তবায়নের পথে ছিল মাইলফলক।
- এক সাধারণ নারী, যিনি হযরত ওমর (রা.) কে মাহর নির্ধারিত করে দেয়ার কারণে জনসম্মুখে জবাবদিহি করেছিলেন।
- ফাতেমা বিনতে কায়স (রা.) একজন সাহাবী ও বিখ্যাত আলেম, যার সাথে ওমর (রা.) এর পরবর্তী খলীফা নিয়োগের ক্ষেত্রে পরামর্শ করা হয়েছিল।
- নাফিসা বিনতে হাসান (রহ.) যিনি ঈমাম শাফীর শিক্ষিকা ছিলেন এবং রাজনীতিতে ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। মিশরের জনগণ শাসকের সাথে উদ্ভূত কোন বিবাদের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার ফিরে পাবার আশায় বিবাদ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তাঁর কাছে যেত।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! এ রকম অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আপনারা নিশ্চয়ই মুসলিম ভূখন্ডে খিলাফত রাষ্ট্র বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসবেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মনোনীত ইসলামী ব্যবস্থাই আমাদের মূল্যবোধ ও মর্যাদাকে রক্ষা করবে। খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বর্তমান দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুলোৎপাটন করে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব। ইসলামী ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, অর্থ বা স্বার্থের ভিত্তিতে নয়। তাই এই ব্যবস্থা কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ বাস্তবায়ন করবে, পুরুষ ও নারীর শোষণের হাত থেকে নারীর দেহকে রক্ষা করবে। রাফি বিন রিফা (রা.) থেকে বর্ণিত, **"রাসূল (সাঃ) দাসী নারীর দু'হাতের উপার্জন ব্যতীত অন্য কোন উপার্জনকে আমাদের জন্য নিষেধ করেছেন।"** (আবু দাউদ)

হে মহান উম্মাহ্‌! ধর্মনিরপেক্ষ আক্বিদা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পরিহার করুন, যা শুধু সমতার নামে দাসত্বের জন্ম দেয়। খিলাফতে রাশিদা বাস্তবায়নের কাজে আমাদের সাথে যোগদান করুন যা দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে; যার পরেই আমরা সকল নারী, পুরুষ ও শিশু মুক্তি পাবো মানব রচিত আইন ও ব্যবস্থার শোষণ থেকে।

মার্কিনীদের উদার গণতন্ত্র মেকি এবং বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র একটি একক কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্র

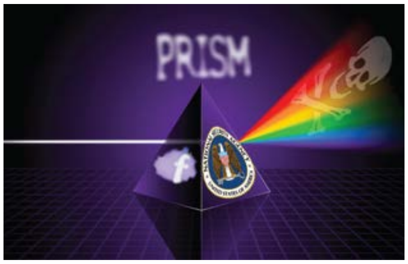

"এটা চিন্তার বাইরে এবং দুঃখের বিষয় যে, সরকার ও জনগণের মধ্যে পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক বিদ্যমান; যেখানে অনাস্থা ও ভয় বিরাজমান এবং সরকারী নীতি ও কর্মপদ্ধতি জাতির সাংবিধানিক ভিত্তিকে ভেঙে দিচ্ছে। এবং এই একক কর্তৃত্বের ক্রমবর্ধমান কালো অধ্যায় যদি বর্জন করা না হয়, আমেরিকা বসবাসের জন্য জীবন্ত নরকে পরিণত হবে" – মাইকেল পেইন

ইদানিংকালে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচরবৃত্তির নতুন নতুন তথ্য বিশ্বব্যাপী শীর্ষ খবরে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনএসএ) নিজ দেশের লাখ লাখ নাগরিকের ওপর মেটা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি করছে এবং গুগলের মতো প্রধান প্রধান মার্কিন কোম্পানীগুলোর ওপর নজরদারি করছে। এনএসএ'র এহেন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধাচরণ করে গুগলের সিইও এরিক স্মিথ বলেন, "এটি সত্যি হতাশাব্যঞ্জক যে, এনএসএ গুগলের তথ্য কেন্দ্রগুলোতে গুপ্তচরবৃত্তি চালাচ্ছে... যথাযথ কোন বিচার বিবেচনা ছাড়াই সংস্থাটি যেভাবে কাজ করছে, তাতে নিশ্চিতভাবেই জনগণের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছেনা; এটা ঠিক নয়।"

যাই হোক, স্মিথের এ মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানীগুলোকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় না। উল্টো প্রিজম নামক একটি জঘন্য প্রোগ্রামের অস্তিত্বই স্মিথের বক্তব্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গুগল, ইয়াহু ও মাইক্রোসফটের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কোম্পানির সহযোগিতায় ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেই সাথে ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভেলেন্স অ্যাক্ট (এফআইএসএ) এর ৭০২ ধারা অনুযায়ী, এনএসএ'র যাবতীয় বিশ্লেষণমূলক তথ্য বিবরণীর একানব্বই শতাংশের ক্ষেত্রে প্রিজমই প্রথম নির্ভরযোগ্য উৎস। সুতরাং, যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কোম্পানীগুলোই ডিজিটাল কায়দায় গুপ্তচরবৃত্তির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

দেশে বিদেশে এনএসএ'র গুপ্তচরবৃত্তির মাত্রা ও ব্যাপকতা সত্যিই অবিশ্বাস্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০১২ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ২০১৩ সালের ৮ জানুয়ারী পর্যন্ত এনএসএ ফ্রান্সের ৭.০৩ কোটি ফোন কলে আড়ি পেতেছে। স্পেনে এনএসএ মাত্র ১ মাসে ৬ কোটি ফোন কল গোপনে অনুসরণ করেছে। সংস্থাটি অন্তত ৩৫ জন আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে। এর মধ্যে এঙ্গেলা মার্কেলও রয়েছেন যার ফোন অন্তত ১০ বছর যাবত আড়ি পাতা হচ্ছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রসেফ প্রতিবাদস্বরূপ তার যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল করেন। মার্কেলের পক্ষে এক বিবৃতিতে বলা হয়, "কাছের বন্ধু ও অংশীদারদের মধ্যে... নেতৃপর্যায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন পর্যবেক্ষণ থাকা উচিত নয়।" মিসেস মার্কেল ওবামাকে বলেছেন, "এ ধরনের চর্চা অতি সত্বর বন্ধ হওয়া উচিত।"

যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের কথা বাদ দিলেও খোদ নিজ দেশের নাগরিক ও বহির্বিশ্বের মিত্ররাও আশ্চর্যান্বিত এই ভেবে যে, কি অপরাধের কারণে তাদের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে। এহেন অপকর্মের ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ প্রশমনে এনএসএ'র সমর্থনে ওবামা প্রশাসন সন্ত্রাসবাদ দমন থেকে শুরু করে সকল রাষ্ট্রই গুপ্তচরবৃত্তি করে, যুক্তরাষ্ট্র এর ব্যতিক্রম নয় ইত্যাদি খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শন করে। এনএসএ'র পরিচালক জেনারেল কিথ আলেকজান্ডার দাবি করে যে, এনএসএ'র নিবিড় পর্যবেক্ষণে ৫৪টি সন্ত্রাসবাদী অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই দমন সম্ভব হয়েছে কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রবল প্রতিবাদের মুখে এনএসএ'র সহকারী পরিচালক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এনএসএ'র নিবিড় পর্যবেক্ষণে মাত্র ১টি সন্ত্রাসবাদী অপরাধ দমন সম্ভব হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচরবৃত্তির এই প্রকল্পের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এনএসএ'কে সহায়তা ও সমর্থন দানের ঘটনায় মাইক্রোসফট, গুগল, ভেরিজোন, এটিএন্ডটি'র মতো যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল প্রযুক্তি কোম্পানীগুলো হাতেনাতে ধরা পড়ার পর এগুলো এখন বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। অন্যদিকে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনে (ব্রিক দেশসমূহ) নতুন ইন্টারনেট তৈরির পরিকল্পনা জোরদার করেছে।

তাই পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংকট মিত্র ও অন্যান্য দেশগুলোর সাথে বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি কাটিয়ে উঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারক ও বাহক যুক্তরাষ্ট্র গভীরতর হুমকির মুখে পড়েছে; কারণ তার আচরণ তার প্রচারিত ও সমর্থিত মূল্যবোধের পরিপন্থি। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কিছুসংখ্যক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এর বিরুদ্ধে কথা বলেছে। উদাহরণস্বরূপ ওয়াশিংটনের বিশ্বব্যাপী গোপন গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থা এডওয়ার্ড স্নোডেন কর্তৃক ফাঁস করা নিয়ে জিমি কার্টারকে যখন প্রশ্ন করা হয়, তখন তার উত্তর ছিল, "যুক্তরাষ্ট্রে এখন কার্যকর গণতন্ত্রের চর্চা নেই।"

ইসলাম তার রাষ্ট্রের নাগরিকের ওপর গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়েছে:

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"এবং একে অপরের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করো না।"** [সূরা আল হুজুরাত : ১২]

এই আয়াত সম্পর্কিত একটি ঘটনা আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) বর্ণনা করেন, "তিনি উমর বিন আল খাত্তাবের (রা.) সাথে রাতে বিচরণ করতেন। একদিন তারা দূরে এক বাড়িতে আলো দেখতে পেলেন এবং সামনে অগ্রসর হলেন। তারা ভেতরে উচ্চ শব্দ শুনতে পেলেন। ওমর (রা.) আব্দুর রহমান (রা.) এর হাত ধরে বললেন, 'এটা কার বাড়ি তুমি কী জান?' তিনি বললেন, 'না'। উমর বললেন, 'এটা রাবিয়া ইবনে উমাইয়া ইবনে খালাফ এর বাড়ি এবং তারা ভেতরে এখন মদ পান করছে মনে হয়! তোমার কাছে কি মনে হয়?' তিনি বললেন, 'আসলে আল্লাহ্‌ যা নিষেধ করেছেন আমরা তা করছি। আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী বলেন, **"গুপ্তচরবৃত্তি করো না।"** [সূরা হুজুরাত: ১২] এবং আমরা তা করছি।" অতঃপর উমর (রা.) ওখান থেকে চলে আসলেন।

আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র শাসনকার্য পরিচালনার নতুন মান নির্ধারণ করবে যাতে করে জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করতে পারে। জনগণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গোয়েন্দাগিরির ভয়ে ভীত থাকবে না এবং পশ্চিমাদের মতো ব্যাপক নজরদারির সম্মুখীনও হবে না।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমীরগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী:

দ্বিতীয় আমীর শাইখ আব্দুল কাদিম যাল্লুম

এক নজরে:

- ১৩৪২ হিজরী (১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) ফিলিস্তিনের আল-খালিল শহরে জন্মগ্রহণ
- ১৯৩৯ সালে তিনি আল আযহার থেকে তাঁর প্রথম ডিগ্রি 'শাহাদাত আল আহলিয়াত আল ঊলা' অর্জন করেন
- ১৯৪৭ সালে তিনি আল আযহার হতে 'আল আলিয়া লি কুলইয়াত আল শারী'আহ্' এবং ১৯৪৯ সালে তিনি 'শাহাদাত আল আলামিয়া' ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ইসলামী আইন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হন, যা পিএইচডি ডিগ্রির সমতুল্য
- ১৯৭৭ সালে হিযবুত তাহ্‌রীর দলের প্রতিষ্ঠাতা আমীর-এর মৃত্যুর পর আমীর এর দায়িত্ব পান
- ৮০ বছর বয়সে ২৭ সফর, ১৪২৪, মঙ্গলবার রাত্রে (২৯ এপ্রিল, ২০০৩) তাঁর সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাত লাভ করেন

তাঁর নাম শাইখ আব্দুল কাদিম বিন ইউসুফ বিন ইউনিস বিন ইব্রাহিম আল শাইখ যাল্লুম এবং তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মনীষী। হিজরী ১৩৪২ অর্থাৎ ১৯২৪ সালে ফিলিস্তিনের আল-খলিল শহরে তাঁর জন্ম। দ্বীন চর্চার জন্য তাঁর পরিবারের অনেক খ্যাতি ছিল। তাঁর পিতা একজন কুর'আনের হাফিজ ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কুর'আন তিলাওয়াতে নিমগ্ন ছিলেন। উসমানী খিলাফতের সময় তাঁর পিতা একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পিতার চাচা আব্দুল গাফ্ফার ইউনিস যাল্লুম উসমানী খিলাফতের সময়ে আল খালিল শহরে মুফতি ছিলেন।

যাল্লুম পরিবার মূলতঃ সেসব পরিবারের অন্তর্ভূক্ত যারা ইব্রাহিমি মসজিদের অভিভাবক এবং এই পরিবার ইয়াকুব (আঃ) এর অন্যতম খাদেম। এই পরিবার শুক্রবারসহ অন্যান্য বিশেষ দিনে মসজিদের মিম্বরে ইসলামী পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব পালন করতো। উসমানি খিলাফত আল-খলিল শহরের বিখ্যাত পরিবারগুলোকে ইব্রাহিমি মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত করত এবং তাঁরা এ দায়িত্বকে অত্যন্ত সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করত।

শাইখ আব্দুল কাদিম যাল্লুমের জীবনের প্রথম পনের বছর আল-খালিল শহরে অতিবাহিত হয়। আল খালিলের ইব্রাহিমি মাদ্রাসা হতে তিনি মৌলিক শিক্ষা অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর পিতা তাঁকে ইসলামী আইনশাস্ত্র বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য আল আযহারে প্রেরণ করেন। তাই ১৫ বছর বয়সে তিনি আল আযহারের উদ্দেশ্যে কায়রো শহরে পাড়ি জমান। হিজরী ১৩৬১ তথা ১৯৩৯ সালে তিনি আল আযহার থেকে তাঁর প্রথম ডিগ্রি 'শাহাদাত আল আহলিয়াত আল ঊলা' অর্জন করেন। হিজরী ১৩৬৬ বা ১৯৪৭ সালে তিনি আল আযহার হতে 'আল আলিয়া লি কুলইয়াত আল শারী'আহ্' এবং হিজরী ১৩৬৮ বা ১৯৪৯ সালে তিনি 'শাহাদাত আল আলামিয়া' ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ইসলামী আইন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হন, যা পিএইচডি ডিগ্রির সমতুল্য।

ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধের সময় তিনি মুসলিমদের একটি দল সংগঠিত করেন এবং মিশর ছেড়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে গমন করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছার পর তিনি জানতে পারেন যে, যুদ্ধ থেমে গিয়েছে এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে। যার ফলে ফিলিস্তিনে তাঁর জিহাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। শাইখ যাল্লুম আল আযহারে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিলেন এবং তাঁকে রাজা (মুলক) বলে ডাকা হত। তিনি একজন সুপরিচিত ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৯ সালে আল খালিলে ফিরে এসে তিনি শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। বেথলেহেম মাদ্রাসার সাথে তিনি দু'বছর সংযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি ১৯৫২ সালে আল খালিলে স্থানান্তরিত হন এবং 'উসামা বিন মা'আকিজ' নামক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন।

১৯৫২ সালে তিনি শাইখ তাক্বি উদ্দীন আন-নাবাহানির সংস্পর্শে আসেন এবং আল কুদসে একটি **হিযব্** (দল) গঠনের বিষয়ে শাইখ তাক্বি উদ্দীন আন-নাবাহানির সাথে তাঁর অনেক তর্ক-বিতর্ক এবং জ্ঞান গর্ভ আলোচনা হয়। এরপর থেকে তিনি এই পবিত্র শহরে প্রায়ই আসতে থাকেন। যেদিন থেকে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর কাজ শুরু হয় সেদিন থেকেই তিনি **হিযব্**-এ যোগদান করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বক্তা এবং মানুষ তাঁকে অসম্ভব ভালোবাসত। শুক্রবারে যখন তিনি ইব্রাহিমি ইউসুফিয়া মসজিদে খুতবা দিতেন, তখন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সংখ্যক লোক এসে জড়ো হতো তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য। শুক্রবারের নামাজের পর যখন তিনি ইব্রাহিমি মসজিদে বয়ান করতেন তখনও প্রচুর লোক সমাগম হত। ১৯৫৪ সালের জনপ্রতিনিধি সভার নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন। এইভাবে ১৯৫৬ সালেও তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু সরকার নির্বাচনে

কারচুপি করে তাঁকে পরাজিত ঘোষণা করে। অতঃপর তাঁকে গ্রেফতার করে আল জাফর আল সাহারায়ী কারাগারে প্রেরণ করে। সেখানে তিনি বহু বছর কাটানোর পর আল্লাহ্‌'র সহায়তায় মুক্তি পান।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রতি সদয় হন, তিনি ছিলেন **হিযব্**-এর প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্বের ডান হাত। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতার ধনুকের তীর, উচ্চ পর্যায়ের ঝটিকা সফরে তিনি তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন। তিনি নির্দ্বিধায় সর্বদা ইসলামের দাওয়াহ'র কাজকে তাঁর পরিবার ও এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর বিলাসিতা থেকে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। একদিন হয়তো তাঁকে তুরস্কে পাওয়া গেল, পরের দিনই তিনি চলে গেলেন ইরাকে, তার পরদিন আবার গেলেন মিশরে, এরপর গেলেন জর্ডানে বা লেবাননে, এভাবেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। যেখানেই তাঁর প্রয়োজন পড়েছে, হক কথা বলার জন্য তিনি সর্বদা আমীরের সঙ্গি হয়েছেন। ইরাকের সফর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন সত্যিকারের সাহসী ব্যক্তিই এ গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিতে সক্ষম ছিলেন। আমীরের প্রদত্ত দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন ও সুচারুরূপে তা পালন করেন। আমীরের তত্ত্বাবধানে তিনি তাঁর দায়িত্ব দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন।

হিযব্-এর প্রতিষ্ঠাতা আমীর তাকি উদ্দীন আন-নাবাহানির মৃত্যুর পর দলের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। তিনি এই সংগ্রামের বোঝা নিজ কাঁধে তুলে নেন এবং দাওয়াহ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দাওয়াহ'র ধরন পরিষ্কার হয়, এর পরিধি প্রসারিত হতে থাকে এবং এটি মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। এই আহ্বানের ধ্বনি ইউরোপেও অনুরণিত হতে থাকে।

> *...তিনি ছিলেন হিযব-এর প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্বের ডান হাত। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতার ধনুকের তীর, উচ্চ পর্যায়ের ঝটিকা সফরে তিনি তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন। তিনি নির্দ্বিধায় সর্বদা ইসলামের দাওয়াহ'র কাজকে তাঁর পরিবার ও এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর বিলাসিতা থেকে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। একদিন হয়তো তাঁকে তুরস্কে পাওয়া গেল, পরের দিনই তিনি চলে গেলেন ইরাকে, তার পরদিন আবার গেলেন মিশরে, এরপর গেলেন জর্ডানে বা লেবাননে, এভাবেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে...*

৮০ বছর বয়স পর্যন্ত এই দৃঢ়চেতা আমীর দাওয়াহ'র পতাকাবাহী হিসেবে তাঁর জীবন পার করেছিলেন; আমীরের ডান হাত হিসেবে ২৫ বছর এবং স্বয়ং আমীর হিসেবে প্রায় ২৫ বছর – যা তাঁর জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ। আসন্ন মৃত্যু অনুমান করতে পেরে তাঁর দায়িত্বের পরিপূর্ণতা বিধানে তিনি তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করে পরবর্তী আমীর নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর অনুমানই সঠিক হয়েছিল। সোমবার, ১৪ মহররম, ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ১৭ মার্চ, ২০০৩ তিনি নিজে নেতৃত্বের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং নতুন আমীর নির্বাচনের কয়েক দিন পরেই তাঁর আত্মা অনন্ত জীবনের পথে পাড়ি জমায়।

এরূপে জ্ঞানের সাগর, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আমীর, শাইখ আব্দুল কাদিম যাল্লুম ৮০ বছর বয়সে ২৭ সফর, ১৪২৪, মঙ্গলবার রাত্রে (২৯ এপ্রিল, ২০০৩) তাঁর সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাত লাভ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে অসংখ্য লোক আল খালিলের আবু গারবিয়া আল শা'রায়ীতে সমবেদনা জানাতে এসেছিল, যা ছিল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। লোকজন বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে এসেছিল। লেখক ও কবিরা তাঁর জীবন নিয়ে গদ্য ও কবিতা রচনা করেছিল। সমগ্র বিশ্ব থেকে টেলিফোন ও রেডিওতে শোকবার্তা এসেছিল। সুদান, কুয়েত, ইউরোপ, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, জর্ডান, ইরাক, মিশর ও অন্যান্য দেশ থেকে অসংখ্য শোকবার্তা এসেছিল। একই সময়ে বৈরুত (লেবানন) ও আম্মানে (জর্ডান) অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছিল।

শাইখ যাল্লুম রাহীমুল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে একজন সাহসী এবং আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি কারোর তিরস্কারকে তোয়াক্কা করেননি। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন সক্রিয় ব্যক্তি যিনি কখনও ক্লান্ত ও হতাশ হননি। তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের নাফসিয়া (মানসিকতা) ও মানবিকতার মূর্ত প্রতীক। হারাম থেকে তিনি নিজেকে অনেক দূরে রাখতেন। তাঁর ছিল অতিমাত্রায় সহ্যক্ষমতা, ধৈর্য্য ও অমায়িকতা। তাঁর অত্যন্ত কাছের বন্ধুরা বলেছেন যে, তিনি রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং আল্লাহ্‌'র আয়াত তিলাওয়াত করে কাঁদতেন। তিনি দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে ছিলেন সুদৃঢ় ও অবিচল। তিনি তাঁর জীবন অখ্যাত হিসেবে কাটিয়েছেন, এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ছেড়ে বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্ত অত্যাচারী শাসকরা সর্বদা তাঁর পেছনে লেগে ছিল। একমাত্র আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'ই তার সংগ্রামের উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ওপর অসীম রহমত বর্ষণ করুন। আমিন।

নিম্নোক্ত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলো তাঁর দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রকাশিত হয়:

১) খিলাফত রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থাপনা
২) 'ইসলামের শাসন ব্যবস্থা' বইয়ের সংযোজন
৩) গণতন্ত্র একটি কুফর ব্যবস্থা
৪) ক্লোনিং ও অঙ্গ প্রতিস্থাপনে শারী'আহ্‌'র বিধান
৫) পরিবর্তনের জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর কর্মপদ্ধতি
৬) **হিযবুত তাহ্‌রীর**
৭) ইসলাম ধ্বংসে আমেরিকার প্রচারণা
৮) জর্জ বুশ কর্তৃক মুসলিমদের ওপর ক্রুসেড আক্রমণ
৯) শেয়ার বাজারের সংকট ও ইসলামী সমাধান
১০) সভ্যতার দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবীতা

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমীরগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী:

বর্তমান আমীর ইসলামী আইন শাস্ত্রের মহান মনীষী, শাইখ আতা বিন খলিল আবু আল রাশতা

হিজরী ১৪২৪, সফর ১১ বা ১৩ এপ্রিল, ২০০৩ **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর দিওয়ান আল মাযালিমের প্রধান **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আমীরের নাম ঘোষণা করেন। তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত আইনবিদ, মনীষী ও প্রকৌশলী আতা বিন খলিল আবু আল রাশতা আবু ইয়াসিন। আমাদের প্রত্যাশা তাঁর নেতৃত্বেই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের বিজয় দান করবেন; দাওয়াহ বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং প্রশাসনিক সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি **হিযব**-এর শাবাবদের (নেতা-কর্মীদের) দক্ষতার সর্বোচ্চ সদ্‌ব্যবহার করেছেন।

শাইখ আতা আবু রাশতার জীবনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক:

আতা বিন খলিল বিন আহমাদ বিন আব্দুল কাদির আল খতিব হিজরী ১৩৬২ সনে বা ১৯৪৩ সালে ফিলিস্তিনের আল খালিল শহরে রা'আনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মভীরু পরিবারে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলাতেই তিনি বিশ্বাসঘাতক আরব শাসক ও বৃটেনের সহায়তায় ফিলিস্তিনে ইহুদী আগ্রাসন ও ফিলিস্তিনি জনগণের দুঃখ দুর্দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইহুদী আগ্রাসনে বাধ্য হয়ে তাদের পরিবার আল খালিল শহরের সন্নিকটে একটি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

সেই শরণার্থী শিবিরেই তিনি তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে আল খালিল শহরের আল হুসাইন বিন আলি নামক স্কুল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের সনদ অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৬০ সালে মিশরীয় সিলেবাস অনুযায়ী আল কুদস শরীফের আল ইব্রাহিমি নামক প্রতিষ্ঠান থেকে আল সানিয়া আল আমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর ১৯৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৬৬ সালে ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বহু আরব রাষ্ট্রে প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। 'আল ওয়াস্ত ফি হিসাব আল কিমিয়াত ও মারাকাবাতাল মাবানি ওয়াত তারাক' নামে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ওপর তিনি একটি বই রচনা করেছেন।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে তিনি যখন মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র, তখন তিনি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এ যোগদান করেন। হক কথা বলার জন্য তাকে বহু নির্যাতন ও কারাবাসের শিকার হতে হয়। তিনি **হিযব**-এর প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে সকল কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দারিস, মুশরিফ, নাকীব, উলাইয়াহ্‌ কমিটির সদস্য, মু'তামাদ এবং আমীরের কার্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। হিজরী ১৪২৪ সনে ১১ সফর বা ২০০৩ সনের ১৩ এপ্রিল তিনি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট সর্বদাই তাঁর প্রার্থনা তিনি যাতে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন। তাঁর রচিত ইসলামী বইসমূহ নিম্নরূপ:

১) সূরা বাকারার তাফসীর 'আত্‌ তাঈ'সীর ফী উসূল আত তাফসীর'

২) দারাসাত ফি উসূল আল ফিক্‌হ - আত্‌ তাঈ'সীরুল উসূল ইলাল উসূল

এছাড়াও তিনি নিম্নোক্ত পুস্তিকাসমূহ রচনা করেছেন:

১) অর্থনৈতিক সংকট, এর বাস্তবতা ও ইসলামের দৃষ্টিতে সমাধান

২) আরব ভূখন্ড ও ভূ-মধ্য সাগরে নয়া ক্রুসেড

৩) শিল্পনীতি ও রাষ্ট্রের শিল্পায়ন

তাঁর সময়ে **হিযবুত তাহ্‌রীর** নিম্নোক্ত বইসমূহ প্রকাশ করেছে:

১) ইসলামী নাফসিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ

২) রাজনৈতিক ইস্যু - অধীকৃত ইসলামী ভূখন্ড সমূহ

৩) ইসলামী ধারণাসমূহ বইয়ের সংযোজন

৪) খিলাফত রাষ্ট্রের শিক্ষানীতির ভিত্তি

৫) খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট সর্বদা তিনি প্রার্থনা করেন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তাঁকে প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে শক্তি ও সাহস দান করেন। এবং তা এমনভাবে পালন করতে পারেন যাতে আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সাঃ) তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবেন। তিনি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দরবারে আরো প্রার্থনা জানান, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তাঁর হাতেই খিলাফত দান করেন; আমাদের সৃষ্টিকর্তা সর্বশ্রোতা এবং আমাদের প্রার্থনা কবুল করেন।

তাঁর সময়ে ২৮ রজব, ১৪২৬ হিজরী (২ সেপ্টেম্বর, ২০০৫) ৮৪ বছর পূর্বে খিলাফত ধ্বংস হবার হৃদয় বিদারক ঘটনার স্মরণে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারা বিশ্বে একযোগে মুসলিমদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। ইন্দোনেশিয়া হতে শুরু হওয়া এ আহ্বান পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে ধ্বনিত হয়েছে এবং শুক্রবারের নামাজে এজন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এ আহ্বানে সমগ্র উম্মাহ্‌ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর বহু সভা-সমাবেশ ও সম্মেলনে তিনি সত্যের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রথম থেকে তাঁর নেতৃত্বের সময়টুকু খায়েরে (উত্তম) পরিপূর্ণ রয়েছে এবং

...১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াতে অনুষ্ঠিত “খিলাফাহ্‌ বাস্তবায়নে আলেমদের ভূমিকা” বিষয়ক সম্মেলনে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় গণমাধ্যম কার্যালয়ের পরিচালক, প্রকৌশলী জনাব ওসমান বাখাস্‌ -এর বক্তব্য

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌’র, যিনি তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন এবং তাঁর বাণী সত্য ব্যতীত আর কিছুই নয়:

“তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌’র উপর বিশ্বাস রাখবে।” [সূরা আলি-ইমরান : ১১০]

এবং মুজাহিদদের নেতৃত্বদানকারী ও আল্লাহ্‌’র রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

“তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজের নিষেধ করবে এবং অত্যাচারী শাসকদের জুলুমের প্রতিবাদ করবে এবং তাকে সৎকাজের আদেশ করবে। অন্যথায় আল্লাহ্‌ তোমাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে দেবেন এবং তিনি বনী ইসরাইলকে যেভাবে অভিশপ্ত করেছিলেন সেভাবে অভিশপ্ত করবেন।” (আবু দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত)

হে সুপ্রিয় প্রখ্যাত আলেমগণ, আপনারা যারা এই দ্বীনের সমর্থনে এবং আল্লাহ্‌’র বাণীকে সুউচ্চে তুলে ধরার নিমিত্তে জাকার্তায় একত্রিত হয়েছেন তাদের আমি ইসলামের পরিভাষায় সম্ভাষণ জানাই: আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

গত রজব মাসে খিলাফত সম্মেলনে আপনাদের সাথে অংশগ্রহণ করার পর আবারও আপনাদের সাথে কথা বলতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, যদিও তা স্কাইপের মাধ্যমে। আমি নিজের চোখে সেইসব ভাইবোনদের দেখেছি যারা গত সম্মেলন সফল করার জন্য দিন-রাত কাজ করেছেন। আল্লাহ্‌ তাদেরকে এই উম্মাহ্‌’র জন্য নির্ধারিত সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন!

প্রিয় বিশিষ্ট আলেমগণ!

আপনারা হচ্ছেন সেই সব ব্যক্তি যাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উম্মাহ্‌’র জন্য জ্ঞানের আমানতকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি (সাঃ) আপনাদেরকে উম্মাহ্‌’র শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর (সাঃ) উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, যাতে করে আপনারা দ্বীনের সেসব বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতে পারেন যেসব বিষয়ে তারা জানে না । আত-তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে:

“আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী।”

আলেমবিহীন জনগোষ্ঠী হচ্ছে অন্ধ; মানবজাতি ও জ্বীনদের মধ্যকার শয়তানরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাদেরকে সবদিক থেকে আক্রমণ করে এবং বিভ্রম ও খেয়ালের মায়াজালে ধ্বংস করে দেয়।

অতএব, আলেমগণ হচ্ছেন আল্লাহ্‌’র তরফ থেকে পৃথিবীর মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ। তারা হচ্ছেন অন্ধকারের মধ্যে আলোকবর্তিকা এবং পথ নির্দেশকস্বরূপ। তারা হচ্ছেন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার দুনিয়াতে তাঁর প্রমাণস্বরূপ। তাদের মাধ্যমে ভুল চিন্তা ও মতবাদসমূহ নিশ্চিহ্ন হয় এবং হৃদয় থেকে সন্দেহের মেঘ দূরীভূত হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাদেরকে আকাশের তারকার সাথে তুলনা করে বলেছেন:

“দুনিয়াতে আলেমগণ হচ্ছেন আকাশের তারার মতো যা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূমিতে ও সমুদ্রে পথের সন্ধান দেয়। যদি তারা ম্রিয়মান হয়ে যায় তাহলে ক্ষমা লাভের পথ ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে যায়।” (আহ্‌মদ কর্তৃক বর্ণিত)

মুসলিমদের ইতিহাস একের পর এক উজ্জ্বল বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পরিপূর্ণ, যেখানে আলেমগণ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছেন যখনই তা সংঘটিত হয়েছে। আলেমগণ সব সময় উম্মাহ্‌কে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সঠিক পথ দেখিয়েছেন। দুর্যোগ ও কষ্টের সময়ে দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে উম্মাহ্‌ তাদেরকে শেষ অবলম্বন হিসেবে ভরসা করেছে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ লাভের জন্য যোগাযোগ করেছে এবং শাসকের অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি লাভের জন্য আস্থা রেখেছে। আলেমগণ শাসক ও গভর্ণরদের তাদের প্রভুর কাছে জবাবদিহিতার বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পূর্বে কখনও কখনও সুলতানগণ আলেমদেরকে নিপীড়ন করেছে, তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে ও শারীরিকভাবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছে, এবং তাদের সম্পদ ও মর্যাদার হানি করেছে। তারপরেও তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কর্তব্য পালনের নিমিত্তে সব কিছু সহ্য করেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌’র (সাঃ) হাদীস অনুসারে কাজ করেছেন:

“শহীদদের সর্দার হচ্ছেন হামযা (রা.) এবং সেই ব্যক্তি যে যালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে হক কথা বলে ও অসৎ কাজের নিষেধ করে এবং সেই জন্য তাকে হত্যা করা হয়।” (আল হাকিম কর্তৃক বর্ণিত)

সত্যিকার অর্থে অতীতে এরূপই ছিলো আলেমদের অবস্থান। অতঃপর প্রথমে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শাসন ও পরে আমেরিকার ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হয়। কুফর শক্তি এমন একটি দল তৈরীর জন্য কাজ করে যারা নিজেদেরকে “আলেম” হিসেবে দাবি করা শুরু করে। বস্তুতঃ তারা ঔপনিবেশিক শক্তির পরামর্শে ও তাদের ব্যবস্থার আদলে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কর্তৃক ঘোষিত হারাম অনুমোদন করে ও সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক ঘোষিত হালাল পরিত্যাগ করে। তারা জনগণকে দ্বীনের ব্যাপারে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করে এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সেইসব ফতওয়া প্রদান করে যেগুলোর মাধ্যমে উম্মাহ্‌কে ঔপনিবেশকদের খেয়াল খুশি মতো তাদের দাম্ভিকতাপূর্ণ, দুর্নীতিগ্রস্থ, বাতিল আইন দ্বারা শাসন

করা হয়।

আমি কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি:

১. প্রথমটি হচ্ছে, মিশরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের সমর্থক মোহাম্মদ আবদুহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ফতওয়া – যেটি ভারতীয় ফতওয়া নামে পরিচিত। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, ব্রিটিশ কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত শারী'আহ্ বিরোধী ইংলিশ আইন দ্বারা শাসন করা কি জায়েয? অনেকগুলো অগ্রহণযোগ্য উদ্ধৃতি সহকারে বিশাল এক উত্তর সে প্রদান করে, যার মোদ্দাকথা হচ্ছে "ভারতে একজন মুসলিমের জন্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে তাদের আইন অনুসারে শাসন করা দুই মন্দের ভালো মূলনীতি অনুসারে জায়েয।" শুধুমাত্র এটুকু বলেই সে থেমে যায়নি বরং আরও বলেছে যে, "যদি এটা ইসলামকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে করা না হয় এবং মুসলিমদের স্বার্থের দিকেও খেয়াল রাখা না হয়।" সুবহানাল্লাহ্! কিভাবে আল্লাহ্'র অবাধ্যতা এবং কাফের দখলদারদের আনুগত্য হালাল হতে পারে?!

২. আরেকটি ঘটনা হচ্ছে ইবনে বায্ এবং তার মতো তথাকথিত সৌদি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আলেমদের দেয়া ফতওয়া, যেটা উপসাগরীয় যুদ্ধে (১৯৯০-১৯৯১) ইরাকি সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা এবং কুয়েত থেকে তাদের বিতাড়িত করার জন্য কুফর আমেরিকার কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনাকে জায়েয করেছে। এই ফতওয়াটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সত্য বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক:

"এবং আল্লাহ্ কখনও কাফেরদের জন্য মু'মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না।" [সূরা আন-নিসা : ১৪১]

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"মুশরিকদের আগুন দ্বারা তোমরা পথ আলোকিত করো না।"

এমনকি মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এর বিতর্কিত মাযহাবের সাথেও এটা অসংগতিপূর্ণ। তথাপিও, ইবনে বায্ ও তার মতো লোকেরা সকল দলিল-প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে বধিরের ন্যায় ওয়াশিংটনের কালো দালানে মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ফতওয়াটি প্রকাশ করেছিল। এই সব আলেমরা ইরাকে মুসলিমদের প্রবাহিত রক্তের গুনাহ্ দ্বারা নিজেদের পূর্ণ করেছে।

৩. যদিও এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে, তারপরেও সবশেষে মুহাম্মদ মুরসির শাসনের বিরুদ্ধে জেনারেল আল-সিসির সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে শাইখ আল-আযহার আহ্মেদ আল-তায়েব-এর অবস্থানের বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই; যদিও মুরসি ইসলাম বাস্তবায়ন করেনি বরং কুফর নৈতিক ভিত্তি "গণতান্ত্রিক বৈধতা"র প্রতি অনুগত ছিল। শাইখ আল-আযহার একটি ভেজাল গণতন্ত্রের নেতৃত্বে শুশ্রূমন্ডিত একজন রাষ্ট্রপতিকে সহ্য করতে পারেনি, কিন্তু মুহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করাকে ন্যায়ানুগ ও বৈধ বলে আখ্যা দিয়ে ওয়াশিংটনের রাজনীতিবিদদের আনুগত্য করাকে পছন্দ করেছে।

প্রিয় বিশিষ্ট আলেমগণ,

১৩৪২ হিজরী সনে/১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের পর কাফের পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ ইসলামী উম্মাহ্'কে বিভক্ত করে ফেলে এবং তাঁবেদার দালাল শাসকদের উম্মাহ্'র উপর চাপিয়ে দেয়, যারা দিবারাত্র যুলুম ও অত্যাচারের মাধ্যমে কুফর শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অতএব মুস্তফা কামাল ও তার মতো শাসকেরা ভীতি প্রদর্শন ও সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমদের পাশ্চাত্যমুখী করে পশ্চিমা সভ্যতার বিষ গলাধঃকরণে বাধ্য করতে ক্রুসেডের মতো অভিযান পরিচালনা করছে। পশ্চিমাদের নীতির সাথে যারা খাপ খাইয়ে নিয়েছে তারাই উচ্চ পদবী ও সুবিধাসম্বলিত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী সুখ শান্তির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর যারাই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং পাপকে বর্জন করে সত্যের উপর অবিচল থাকতে চেয়েছে তারাই কারাভোগ, নির্বাসন, হত্যা ও যন্ত্রণার দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। এমনকি তাদের পরিবার-পরিজন, সমর্থক ও সাহায্যকারী অন্যান্য মুসলিমও মুক্তি পায়নি। উদাহরণস্বরূপ: **হিযবুত তাহ্রীর**-এর শাবাব (নেতা-কর্মীগণ) যারা রাশিয়া, ইরাক, তাজিকিস্থান, উজবেকিস্তানে শাহাদাত বরণ করেছেন; ইনশাআল্লাহ্ তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি সহকারে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং এটা হচ্ছে অনেকগুলো উদাহরণের একটি মাত্র।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব সিরিয়ার (আশ্-শামের) মুসলিমদের রক্তপাতের ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে; অথচ এই সিরিয়াকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মজীদে পবিত্র ভূমি বলে ঘোষণা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) «عُقْرُ دَارِ الإِسْلاَمِ» **"ইসলামের বাসস্থান"** হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কুফর দেশগুলোর মিথ্যাবাদী মানুষেরা এবং তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী ইরান, উপসাগরীয় অঞ্চল, তুরস্ক এবং জর্ডানের শাসকেরা আশ্-শামের অধিবাসীদের বলছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কুফর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিষ গ্রহণ করছ ততক্ষণ পর্যন্ত হয় রাসায়নিক অস্ত্র নতুবা বিস্ফোরকের মাধ্যমে মৃত্যুকে বেছে নাও।

এ তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ ...

আমি আপনাদের পবিত্র জমায়েতকে অভিবাদন জানাই এবং আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আপনাদেরকে জ্ঞানের আমানতকারী হিসেবে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাতে সফলতা দান করেন এবং জনসাধারণকে তাদের দ্বীনের কর্তব্যগুলোর ব্যাপারে আপনারা শিক্ষা দিতে পারেন। এ পথের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্র বাস্তবায়ন, যেখানে জনগণ সম্মান, মর্যাদা এবং আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি খুঁজে পাবে।

যিনি পূর্ব-পশ্চিমের মুসলিম দেশগুলোতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন বিতর্ক ও আলোচনাগুলো মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন, তিনি কুফর মতামত ধ্বংস করার, ইসলামী চিন্তাধারার উপর গুরুত্বারোপ করার ও কাফের রাষ্ট্রগুলোর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে তার নিজের অগ্রগামী ভূমিকার প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যেসব দালাল রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবি মুসলিমদের বিভক্ত করছে ও শত্রু পক্ষের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদের প্রকৃত স্বরূপ জনগণের সামনে উন্মোচন করে দিন। আমরা আপনাদেরকে আমাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি উম্মাহ্'কে আমন্ত্রণ জানানোর আহ্বান করছি:

১. মুসলিমদের প্রকৃত নেতৃত্ব তথা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুনরায় বাস্তবায়নের দাওয়াত বহন করুন। এটা কোন আঞ্চলিক দেশ কিংবা জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নয় বরং এটা হচ্ছে ইসলামী আক্বিদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র যা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শারী'আহ্ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াহ সমগ্র বিশ্বে নিয়ে যাবে এবং অন্ধকার দূরীভূত করে পৃথিবীকে আলোকিত করবে।

২. রাসূলুল্লাহ্'র (সাঃ) পদ্ধতি অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে উম্মাহ্'কে শাসন ক্ষমতা গ্রহণের দিকে পরিচালিত করুন।

৩. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে কোন ধরনের ছাড় দেয়া যাবে না। তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে

এবং তাদের মোনাফেকী নীতিসমূহ প্রকাশ করতে হবে, সেই সাথে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের অবস্থান ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে।

৪. এসকল কাজে আমাদের শ্লোগাণের ভিত্তি সবসময় রাসূলুল্লাহ্‌'র (সাঃ) হাদীস হওয়া উচিত:

"আল্লাহ্‌'র কসম যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র দেয় তবুও আমি এটা পরিত্যাগ করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ এটা প্রতিষ্ঠা করেন অথবা এটা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আমার মৃত্যু হয়ে যায়।"

আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে আল্লাহ্‌ সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের প্রতি তার ওয়াদা রক্ষা করবেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন। যেমন তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের ভয়ভীতির পরে তা পরিবর্তিত করে দেবেন নিরাপত্তায়। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর যারা এরপরও অবিশ্বাস করবে, তারাই তো নাফরমান।" [সূরা আন-নূর : ৫৫]

আমরা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌'র কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের তাঁর দ্বীনের মাধ্যমে বিজয় দান করেন এবং আমাদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন। হতে পারে সেটা শীঘ্রই অথবা বিলম্বে, তিনিই এর মালিক এবং এটা করতে তিনি অত্যন্ত পারঙ্গম।

ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

...১২ পৃষ্ঠার পর থেকে

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমীরগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী:
শাইখ আতা বিন খলিল আবু আল রাশতা

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাঁর নেতৃত্বের বাকি দিনগুলোতেও বরকত কামনা করি। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা'র ইচ্ছায় তাঁর নেতৃত্বের অধীনে নুসরাহ্‌'র পরিষ্কার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হচ্ছে। তাঁর হাতেই মহান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বিজয় দান করবেন – আমরা সেই প্রত্যাশায় রয়েছি, আমিন।

এই মহান আমীরের আল্লাহ্‌ভীরুতা উল্লেখ করার মতো। তিনি আবেগের সাথে তাঁর উদ্দেশ্য অর্জনে উদ্বিগ্ন এবং সর্বদা তাঁর দায়িত্ব পালনে উদার। **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকালে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ ছিল মু'তামাদ, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর মুখপাত্র ও প্রাক্তন আমীরের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন। এ কারণেই তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও সম্যক অবগত। তিনি যথেষ্ট দক্ষতা ও সচেতনতার সাথে **হিযব**-এর সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন; **হিযব**-এর শাবাবগণ (নেতা-কর্মীগণ) কার্যক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে; সেকাজ বড় বা ছোট যা-ই হোক না কেন। এভাবেই তিনি শাবাবদের যোগ্যতা ও দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

...২০ পৃষ্ঠার পর থেকে

...ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা করবে। সুতরাং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের চেয়ে প্রয়োজন ও সম্পদকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে। অর্থাৎ সমস্যা হল প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পদকে সুলভ করতে হবে, কিন্তু সেটা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নয়। সুতরাং এটি অপরিহার্য যে যেসব আইন প্রণয়ন করা হবে সেগুলোকে অবশ্যই সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যাতে করে সম্পদের সর্বোচ্চ সরবরাহ অর্জন করা সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ সামগ্রিতকভাবে জাতির কাছে পণ্য ও সেবা সরবরাহ করা যায়, অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে নয়। সুতরাং পণ্য ও সেবার বন্টন উৎপাদনের সমস্যার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং অর্থনীতি অধ্যয়ন ও গবেষণার উদ্দেশ্য হল সমাজের ভোগের জন্য পণ্য ও সেবা বৃদ্ধি করা। সুতরাং এটি অবাক হওয়ার বিষয় নয় যে যেসব নিয়ামক জাতীয় আয়ের (GDP and GNP) আকারকে প্রভাবিত করে সেগুলোর অধ্যয়ন বাদ বাকী সব কিছুর উপর প্রাধান্য লাভ করে। কারণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির অধ্যয়ন অর্থনৈতিক সমস্যা অর্থাৎ প্রয়োজনের বিপরীতে পণ্য ও সেবার দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যার সমাধান করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তারা মনে করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়া দরিদ্রতা ও বঞ্চনা নিরসন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজ যেসব অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর সমাধান কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই করা সম্ভব।

উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (value) বলতে এর গুরুত্বের মাত্রাকে বুঝায়; যেখানে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির বা কোন এক বিশেষ বস্তুর সাপেক্ষে সে মাত্রা নির্ধারিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এটাকে 'উপযোগের মূল্য' (the value of the benefit) বলা হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এটিকে 'বিনিময়ের মূল্য' (value of exchange) বলা হয়। একটি বস্তু থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে যেভাবে বর্ণনা করা যায় তার চুম্বকাংশ হল: একটি বস্তুর যে কোন এককের উপযোগের মূল্য এর প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা পরিমাপ করা হয় অর্থাৎ সর্বনিম্ন প্রয়োজন যে পরিমাণ বস্তু দ্বারা পূরণ করা যায় সে পরিমাণ বস্তুর উপযোগ। তারা এটিকে 'প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্ব' বা 'The Theory of Marginal Utility' বলে। এর অর্থ হল উপযোগ কেবলমাত্র এর উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিমাপ করা হয় না অর্থাৎ উৎপাদন খরচ দ্বারা মূল্যায়িত হয় না, তাহলে সেক্ষেত্রে চাহিদা বিবেচনা না করে কেবল যোগানই বিবেচনা করা হত। আবার এটিকে কেবলমাত্র ভোক্তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা ঠিক হবে না অর্থাৎ এর উপযোগ এবং চাহিদা বিবেচনা করার সাথে সাথে এর আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা বিবেচনা করতে হবে। কেননা এতে করে যোগানের বিষয়টি হিসেবে না এনে চাহিদা বিবেচনা করা হবে। বাস্তবিকভাবে তারা বলে যে, যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে একত্রে উপযোগকে দেখা উচিত। সুতরাং সর্বনিম্ন যে উপযোগ প্রয়োজন পূরণ করে তার ভিত্তিতে একটি বস্তুর উপযোগ পরিমাপ করা হয় অর্থাৎ সন্তুষ্টির সর্বনিম্ন বিন্দু থেকে। সুতরাং এক টুকরো রুটির মূল্য সবচেয়ে কম ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় পরিমাপ করা হবে, সর্বাধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় নয় এবং সেসময় বাজারে রুটি সুলভ থাকতে হবে এবং যখন সুলভ নয় এমন অবস্থায় পরিমাপ করা যাবে না।

বিনিময়ের মূল্যের ক্ষেত্রে বলা যায়, এটি হল একটি বস্তুর এমন বৈশিষ্ট্য যা থাকার কারণে সেটি বিনিময়ের উপযোগী হয়। একটি বস্তুর বিনিময়ের শক্তিমত্তা আপেক্ষিকভাবে অন্য একটি বস্তুর সাথে তুলনা করে নিরূপণ করা হয়; যেমন: ভূট্টার সাথে গমের বিনিময় মূল্য হিসেব করতে হলে দেখতে

হবে এক একক গম পাবার জন্য কত একক ভুট্টা বিনিময় করতে হয়। তারা কেবলমাত্র 'উপযোগ' শব্দ দ্বারা উপযোগের মূল্য এবং কেবলমাত্র 'মূল্য' শব্দ দ্বারা বিনিময়ের মূল্য বুঝিয়ে থাকে।

মূল্যের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ দু'টি পণ্য ও সেবার মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়। সেকারণে অর্থনীতিবিদদের জন্য মূল্য অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। কেননা এটি হল বিনিময়ের ভিত্তি এবং এমন একটি উপযোগ যা পরিমাপ করা যায়। এটি এমন একটি মানদন্ড যার মাধ্যমে পণ্য ও সেবা পরিমাপ করা হয় এবং এর মাধ্যমে কোন কাজ উৎপাদনমুখী কিনা তা পরিমাপ করা হয়।

তাদের দৃষ্টিতে উৎপাদন হল কাজের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করা। সুতরাং কোন কাজটি উৎপাদনশীল এবং কোনটির অনেক বেশী উৎপাদনশীলতা রয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্য ও সেবার জন্য একটি সূক্ষ্ম মানদন্ড থাকা উচিত। এ মানদন্ড হল বিবিধ পণ্য ও সেবার বিষয়ে সামাজিক মূল্য। অন্য কথায় এটি হল ব্যয়কৃত শ্রম ও প্রদত্ত সেবার যৌথ মূল্যায়ন। আধুনিক সময়ে 'ভোগ করার জন্য উৎপাদন' দ্বারা 'বিনিময়ের জন্য উৎপাদন' প্রতিস্থাপিত হওয়ায় এ মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অবস্থা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কার্যত প্রত্যেক ব্যক্তি তার উৎপাদনকে অন্য আরেকজনের উৎপাদিত পণ্যের সাথে বিনিময় করে থাকে। পণ্য ও সেবার ক্ষতিপূরণের (compensation) মাধ্যমে বিনিময় সম্পাদিত হয়। সেকারণে পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে একটি মানদন্ড থাকা উচিত যাতে করে বিনিময় করা যায়। সুতরাং উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে 'মূল্য কী' – সে ব্যাপারে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে অর্থাৎ উপকরণসমূহ ব্যবহার করে মানুষের অভাব পূরণ করার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

আধুনিক ইতিহাসে, এ বিনিময়ের মূল্যকে এর একটি মূল্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং এ ধরনের মূল্য প্রণিধানযোগ্য হয়ে পড়েছে। উন্নত সম্প্রদায়ে পণ্যসমূহের মূল্য একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং একটি বিশেষ পণ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত – যাকে অর্থ (money) বলা হয়। অর্থের সাথে কোন পণ্য বা সেবার বিনিময়ের অনুপাতকে তাদের দাম (price) বলা হয়। সুতরাং দাম হল অর্থের তুলনায় একটি পণ্য বা সেবার বিনিময়ের পরিমাণ। অতএব বিনিময়ের মূল্য (value of exchange) ও দামের (price) মধ্যে পার্থক্য হল বিনিময়ের মূল্য হল একটি বস্তুর সাথে অপর কিছুর বিনিময়ের হার – হতে পারে সেটি অর্থ, পণ্য বা সেবা। অন্যদিকে দাম হল অর্থের সাথে বিনিময় মূল্য। এর অর্থ হল সব পণ্যের দাম একটি নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে বাড়তে পারে এবং অপর একটি নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে হ্রাস পেতে পারে। অন্যদিকে একে অপরের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে সব পণ্যের বিনিময় মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে বাড়া বা কমা সম্ভব নয়। আবার বিনিময় মূল্যে কোনরূপ পরিবর্তন না এনে পণ্যের দামে পরিবর্তন আসা সম্ভব। সুতরাং পণ্যের দাম হল এর মূল্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি। অন্য কথায় এটি অর্থের তুলনায় পরিমাপ করা একটি মূল্যমাত্র। যেহেতু দাম হল অন্যতম একটি মূল্য সেহেতু একটি বস্তু উপকারী কিনা বা উপযোগের মাত্রা কতটুকু সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দামকে ব্যবহার করা স্বাভাবিক। সুতরাং একটি পণ্যকে ফলদায়ক ও উপকারী তখনই বিবেচনা করা হবে যখন সমাজ এ বিশেষ পণ্য ও সেবাকে একটি দাম দ্বারা মূল্যায়ন করে। পণ্য বা সেবার উপযোগের মাত্রা এমন একটি দাম দ্বারা পরিমাপ করা হয় যা অধিকাংশ ভোক্তা মালিকানায় নেয়া বা সদ্ব্যবহার করবার জন্য দিতে সম্মত থাকে – হোক সে পণ্য কৃষিজাত বা শিল্পজাত এবং সে সেবা একজন ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক, ডাক্তার বা প্রকৌশলীর।

উৎপাদন, ভোগ, বন্টনের ক্ষেত্রে দাম যে ভূমিকা রাখে তা হল, দামের ব্যবস্থাপনা (price mechanism) নির্ধারণ করে কোন উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করবে এবং কোন উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করবে না। একইভাবে দামই নির্ধারণ করে কোন ভোক্তা পণ্য দিয়ে তার প্রয়োজন মেটাবে এবং কোন ভোক্তা পণ্য ভোগ করতে সমর্থ হবে না। একটি পণ্যের উৎপাদন খরচ বাজারে এর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক ও পণ্যের উপযোগ বাজারে এর চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে এবং উভয়ক্ষেত্রে দাম দ্বারা এসব পরিমাপ করা হয়। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চাহিদা ও যোগান (demand and supply) অধ্যয়ন করা মৌলিক ইস্যু। যোগান বলতে বাজারে সরবরাহ করা বুঝায় এবং একইভাবে চাহিদা বলতে বাজারের চাহিদা বুঝায়। চাহিদা দাম উল্লেখ ব্যতিরেকে যেমনি বলা যায় না, তেমনি সরবরাহও দাম ব্যতিরেকে মূল্যায়ন করা যায় না। তবে চাহিদা দামের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ যদি দাম বাড়ে তাহলে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। সরবরাহের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কটি ঠিক উল্টো, অর্থাৎ দামের অনুপাতে যোগান পরিবর্তিত হয়। সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যদি দাম বাড়ে এবং সরবরাহ হ্রাস পায় যদি দাম কমে যায়। যোগান ও চাহিদা এ উভয়ক্ষেত্রে দামের সবচেয়ে বড় প্রভাব রয়েছে; ফলে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রেও রয়েছে এর বড় প্রভাব।

পুঁজিবাদীদের মতে দামের ব্যবস্থাপনা হল সমাজে ব্যক্তির মধ্যে পণ্য ও সেবা বন্টনের আদর্শ পদ্ধতি। কেননা মানুষ যে শ্রম ব্যয় করে তার ফলই হল উপযোগ। সুতরাং ক্ষতিপূরণ (compensation) যদি শ্রমের সমান না হয় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে উৎপাদন কমে যাবে। সুতরাং সমাজে পণ্য ও সেবা বন্টনের আদর্শ পদ্ধতি হল এমন একটি ব্যবস্থা যা সর্বোচ্চ উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করে। এ পদ্ধতি হল দামের পদ্ধতি – যাকে দামের ব্যবস্থা বা দামের ব্যবস্থাপনা বলা হয়। তারা মনে করে দামের ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থার (economic equilibrium) সৃষ্টি করে। যেহেতু এটি ভোক্তাকে কিছু পণ্যের ব্যাপারে তার চাহিদা এবং অন্যকিছুর ব্যাপারে চাহিদা না থাকার ভিত্তিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত সমাজের মালিকানাধীন সম্পদের বন্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করার সুযোগ দেয়। সুতরাং যা প্রয়োজন ও পছন্দনীয় তা ক্রয় করার জন্য তাদের আয়কে ব্যয় করে। সুতরাং যে ভোক্তা মদ পছন্দ না করে সে সেটি ক্রয় না করে অন্য কিছুর পেছনে তার আয় ব্যয় করবে। মদ অপছন্দ করে এমন ক্রেতার সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, অথবা সবাই মদকে অপছন্দ করা শুরু করে, তাহলে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে মদ উৎপাদন করা অলাভজনক হয়ে যাবে। এভাবে মদের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে এবং একই নিয়ম অন্য পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভোক্তাগণ কী ক্রয় করবে এবং কী ক্রয় করবে না এ ব্যাপারে তারা স্বাধীন বিধায় উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকরণকে তারাই নির্ধারণ করে। তারা তা করে দামের মাধ্যমে এবং পণ্য ও সেবার বন্টনও ঘটে, যদিও ভোক্তা কর্তৃক প্রদেয় দাম

সরাসরি উৎপাদক পায় না এবং ভোক্তা উৎপাদককে দেয়ও না।

দামের ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের উদ্দীপক। এটি বন্টনের নিয়ন্ত্রক এবং উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী, অর্থাৎ এটি এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সাম্যাবস্থা অর্জন হয়।

দামের ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের উদ্দীপক, কেননা যে কোন মানুষের কোন ফলদায়ক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের কারণ হল বস্তুগত লাভ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা এ সম্ভাবনা বাদ দিয়েছে যে কোন মানুষ আধ্যাত্মিক বা নৈতিক কারণে প্রচেষ্টা চালাতে পারে। যখন তারা নৈতিক উদ্দেশ্যকে সনাক্ত করে তখন সেটিকে বস্তুগত লাভের জন্য করা হয় বলে ধরে নেয়। তারা বিবেচনা করে যে, মানুষ কেবলমাত্র তার বস্তুগত অভাব ও ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে। এ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে ব্যক্তি সরাসরি যা উৎপাদন করে সেগুলোর ভোগ থেকে অথবা এমন কোন আর্থিক পুরস্কার থেকে যার মাধ্যমে সে অন্যদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে সক্ষম হয়। যেহেতু মানুষ অন্যের সাথে প্রচেষ্টা বিনিময় করার মাধ্যমে তার অধিকাংশ বা সব প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু প্রয়োজন পূরণ করার প্রচেষ্টা আর্থিক পুরস্কারের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। এই আর্থিক পুরস্কার তাকে পণ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে এবং একইভাবে সে যেসব পণ্য উৎপাদন করে তা পাওয়া তার লক্ষ্য থাকে না। সুতরাং আর্থিক পুরস্কার বা দাম পণ্য উৎপাদনের জন্য মূল লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ দাম হল এমন একটি উপায় যা উৎপাদককে তার প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং দাম উৎপাদনের উদ্দীপক।

দাম হল এমন একটি উপায় যা বন্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ মানুষ তার সব প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণ করতে চায় এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য পণ্য ও সেবা অর্জনে সে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায়। যদি প্রত্যেক মানুষকে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত তাহলে সে তার পছন্দমত যে কোন পণ্য লাভ করতে ও ভোগ করতে ক্ষান্ত হত না। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রচেষ্টা চালায়, সেহেতু একজন মানুষকে তার প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সে সীমায় থেমে যেতে হয় যেখানে সে নিজের প্রচেষ্টা অন্যের প্রচেষ্টার সাথে বিনিময় করতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ তার প্রচেষ্টার কারণে সে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ লাভ করে সে সীমা পর্যন্ত অর্থাৎ দামের সীমা পর্যন্ত। সুতরাং দাম স্বাভাবিকভাবে মানুষকে কোন কিছু লাভ ও ব্যয় করার ক্ষেত্রে একটি সীমার মধ্যে বেধে রাখার জন্য বাধ্য করে এবং এই সীমাটি হল তার আয়ের সীমা। সুতরাং দাম মানুষকে চিন্তা, মূল্যায়ন, তার পূরণ করতে হবে এমন তুলনামূলক প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য করতে দেয়, অর্থাৎ যা তার জন্য অপরিহার্য সেটি সে গ্রহণ করে এবং যা কম গুরুত্বপূর্ণ তা ছেড়ে দেয়। সুতরাং দাম কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ভোক্তাকে আংশিক চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য করে – যাতে করে গুরুত্বপূর্ণ অন্য প্রয়োজনগুলো সে পূরণ করতে পারে।

সুতরাং দাম হল এমন একটি উপায় যা ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় উপযোগসমূহের বন্টন নিয়ন্ত্রণ করে। উপযোগ প্রাপ্তির আকাঙ্খা করে এমন ভোক্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ উপযোগের বন্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে দাম। ভোক্তাদের আয়ের বৈষম্যের কারণে তাদের আয় তাদের ব্যয়কে একটি সীমার মধ্যে বেধে রাখে। এর কারণে কিছু পণ্য কেবল সামর্থবান লোকেরাই ভোগ করতে পারে এবং বাকী কিছু পণ্য কম দামের হওয়ায় সবাই ভোগ করতে পারে। সুতরাং কিছু পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে দাম বেশী ও অন্য কিছুর জন্য দাম কম এবং কিছু ভোক্তার চেয়ে অন্য কিছু ভোক্তার কাছে দামের তুলনামূলক যথার্থতা ঠিক করে দেয়ার মাধ্যমে দাম ভোক্তাদের মধ্যে উপযোগ বন্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের কাজ করে।

দাম উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সাম্যাবস্থা আনয়ন করে এবং এটি উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যকার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। কেননা ভোক্তার আকাঙ্খা পূরণকারী উৎপাদক লাভের মাধ্যমে পুরস্কৃত হন। অন্যদিকে যেসব উৎপাদকের পণ্য ভোক্তাদের দ্বারা গৃহীত হবে না, সে লোকসানের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদক ভোক্তার আকাঙ্খা চিহ্নিত করে, তা হল দাম। যদি ভোক্তার কাছে কোন পণ্যের চাহিদা থাকে তাহলে এর দাম বেড়ে যাবে, ফলে ভোক্তার আকাঙ্খা পূরণ করতে গিয়ে এর উৎপাদনও বেড়ে যাবে। যদি ভোক্তাগণ একটি বিশেষ পণ্য ক্রয় করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বাজারে এর দাম কমে যাবে ও সে পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাবে। সুতরাং পণ্যের দাম বাড়ার সাথে সাথে উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগকৃত সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং দাম কমার সাথে সাথে হ্রাস পায়। এভাবে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সাম্যাবস্থা অর্জনে দাম সহায়তা করে এবং উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে এবং এই প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত হয়। সুতরাং পুঁজিবাদীদের মতে, দাম হল অর্থনীতির ভিত্তি যার উপর এটি দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের মতে এটি অর্থনীতির স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

এই হল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সারমর্ম – যাকে রাজনৈতিক অর্থনীতি বলা হয়। গভীর অধ্যয়নের পর পুঁজিবাদী অর্থতৈক ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিসমূহ পরিষ্কার হয়ে উঠে:

১. প্রয়োজন ও তা পূরণের উপায়সমূহ মিশ্রিতকরণ

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনীতি মূলতঃ মানুষের প্রয়োজন ও তা পূরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করে। সেকারণে প্রয়োজন পূরণের উপায় হিসেবে **পণ্য ও সেবার উৎপাদন** এবং **পণ্য ও সেবার বন্টন** তাদের দৃষ্টিতে একই বিষয়। প্রয়োজন ও তা পূরণের উপায় পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ও এমনভাবে অবিচ্ছেদ্য যে একটি আরেকটি মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে বিধায় এগুলো একই বিষয়। ফলে পণ্য ও সেবার উৎপাদনের মধ্যে পণ্য ও সেবার বন্টন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। এর উপর ভিত্তি করে তারা অর্থনীতিকে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে যেখানে অর্থনৈতিক পণ্য ও পণ্যের মালিকানা লাভ করার পদ্ধতিকে কোনরূপ পার্থক্য করা ছাড়া এক করে দেখা হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা ছাড়া তারা এক করে দেখে। তবে অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বনাম অর্থনৈতিক বিজ্ঞান

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল তাই যা কীভাবে সম্পদের বন্টন হবে, কীভাবে এর মালিকানা লাভ করা যাবে, কীভাবে ব্যয় ও হস্তান্তর করা হবে তা নির্ধারণ করে। এসব বিষয় নির্ধারণ করা হয় জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শ অনুসরণ করে। সুতরাং ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র/কম্যুনিজম এবং পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ এ ব্যবস্থাগুলোর প্রত্যেকটি জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে।

অর্থনৈতিক বিজ্ঞান উৎপাদন, এর উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও এর উপকরণের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত অর্থনৈতিক বিজ্ঞান সব জাতির জন্য সার্বজনীন এবং কোন আদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পুঁজিবাদে মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতন্ত্র/কম্যুনিজম ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। তবে উৎপাদন বৃদ্ধি করার আলোচনা একটি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ইস্যু এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সর্ম্পকহীন ও সব লোকের জন্য সমান।

মানুষের প্রয়োজন এবং তা পূরণ করার বিষয় অধ্যয়ন – একটি বিষয় হিসেবে অর্ন্তভুক্তি অর্থাৎ অর্থনৈতিক পণ্য উৎপাদন করা ও তা বন্টনের ধরণকে এক বিষয় ও ইস্যু হিসেবে দেখা ভুল। যার ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অধ্যয়নে মিশ্রণ ও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিই ভুল।

২. মানুষের প্রয়োজন কেবলই বস্তুগত

যেসব প্রয়োজন পূরণ করতে হয় সেগুলো সব কেবলই বস্তুগত – এটি ঠিক নয় এবং প্রয়োজনের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। বস্তুগত প্রয়োজন ছাড়াও মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা রয়েছে এবং এগুলো পূরণ হওয়া দরকার এবং এগুলোর প্রত্যেকটির পূরণের জন্য পণ্য ও সেবা প্রয়োজন।

৩. পণ্য ও সেবাসমূহ সমাজের কাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়

পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা সমাজ কিরকম হওয়া উচিত সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রয়োজন ও উপযোগ যেমন সেগুলোকে তেমনভাবেই দেখেছে, অর্থাৎ তারা মানুষকে আধ্যাত্মিক চাহিদা, নীতি চিন্তা বিবর্জিত ও নৈতিক উদ্দেশ্য শূন্য একটি বস্তুগত প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করেছে। একইভাবে নৈতিকতার উৎকর্ষতার ভিত্তিতে সমাজ কীভাবে গঠিত হয়, ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কগুলো কীভাবে নিরূপিত হয় অথবা সমাজে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্থাৎ আল্লাহ্‌'র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সব সম্পর্কের পেছনে মানুষের সাথে আল্লাহ্‌'র সম্পর্ক উপলব্ধিকে চালিকা শক্তি হিসেবে কীভাবে থাকা উচিত সে ব্যাপারে তারা পরোয়া করে না। বস্তুগত চাহিদা পূরণ করার জন্য তার লক্ষ্যও পুরোপুরি বস্তুগত হওয়ায় পুঁজিবাদীরা এসবকে পরোয়া করে না। তার ব্যবসায় যদি লাভ হয় তাহলে সে প্রতারণা করে না, আর প্রতারণা করে যদি লাভ করা যায় তাহলে তার জন্য সেটি বৈধ। স্রষ্টার নির্দেশ মোতাবেক দান করার জন্য সে দরিদ্র মানুষকে খাওয়ায় না, বরং দরিদ্র লোক যাতে তার কাছ থেকে চুরি না করে সে জন্য তাদের খাওয়ায়। যদি দরিদ্র মানুষকে না খাওয়ালে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় তবে সে তাই করবে। সুতরাং পুঁজিবাদীদের প্রধান উদ্বেগ হল কেবলমাত্র বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ করে যে লাভ – সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ব্যক্তি তার নিজের লাভের ভিত্তিতে অন্যের দিকে তাকায় এবং এর ভিত্তিতে অর্থনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠা করে এবং এরূপ লোক সমাজ ও জনগণের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি।

এটি হল প্রয়োজন ও উপযোগের আলোকে আলোচনা। সম্পদ ও শ্রমের নিরীখে অর্থাৎ যেগুলোকে পণ্য ও সেবা বলা হয় সেগুলোকে পাওয়ার জন্য ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে উপযোগ পাওয়া যায়। সম্পদ ও শ্রমের বিনিময়ের কারণে লোকদের মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে গঠিত হয় সামাজ কাঠামো। সুতরাং সম্পদ ও শ্রমকে মূল্যায়ন করার সময় সমাজের কাঠামো কীরকম হওয়া উচিত তা সাধারণ ও বিস্তারিত উভয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য।

সমাজ কীরকম হওয়া উচিত সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অর্থনৈতিক পণ্যের দিকে কেবল দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অর্থনৈতিক পণ্যকে সমাজ বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন করার নামান্তর – যা অস্বাভাবিক। এই অর্থনৈতিক পণ্য লোকদের মধ্যে বিনিময় হয়, ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং সমাজ থেকেও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক পণ্যকে বিবেচনা করার সময় সমাজের উপর এর প্রভাব উপলব্ধি করা উচিত। কেউ পছন্দ করে বলে একটি পণ্যকে সমাজের উপযোগী বলে বিবেচনা করা ঠিক নয় – হতে পারে এটি নিজেই ক্ষতিকারক অথবা ক্ষতিকারক নয়, এটি মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে অথবা করে না, সমাজের লোকদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে এটি অনুমোদিত অথবা নিষিদ্ধ। বরং একটি পণ্যকে তখনই উপযোগী বলা উচিত যখন এর থেকে সমাজ যে রকম হওয়া উচিত তার ভিত্তিতে সত্যিকার অর্থে সমাজ উপকৃত হয়। সুতরাং ক্যানাবিস, আফিম ও এজাতীয় তথাকথিত পণ্যকে উপযোগী বিবেচনা করা ও কেউ এগুলো চায় বলে সেগুলোকে অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা সঠিক হবে না। তার বদলে যখন কোন অর্থনৈতিক পণ্যকে উপযোগী বিবেচনা করা হবে তখন সমাজের লোকদের সম্পর্কের উপর এর প্রভাব বিবেচনা করতে হবে, অর্থাৎ এর ভিত্তিতে পণ্যটিকে আমরা অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে বিবেচনা করব অথবা করব না। সমাজ যে রকম হওয়া উচিত এর ভিত্তিতে জিনিসসমূহকে দেখা উচিত। সমাজ কীরকম হওয়া উচিত তা বিবেচনায় না এনে পণ্যটিকে খোলা চোখে যেরকম মনে হয়, সেরকম মনে করা ভুল।

প্রয়োজন পূরণ করার বিষয়টি প্রয়োজন পূরণের উপকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে এবং অন্য কিছু বিবেচনায় না এনে প্রয়োজন পূরণের উপকরণকে প্রয়োজন পূরণের একমাত্র অবলম্বন মনে করে অর্থনীতিবিদেরা সম্পদের বন্টনের চেয়ে সম্পদ সৃষ্টি করার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পদ বন্টন করার গুরুত্ব এখানে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটিই লক্ষ্য এবং সেটি হল সামগ্রিকভাবে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং এটি সর্বোচ্চ পরিমাণের উৎপাদন অর্জন করার জন্য কাজ করে। এটি বিবেচনা করে যে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং উৎপাদন ও মালিকানা লাভ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্পদ অর্জন করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে সমাজের সদস্যদের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। সুতরাং ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করা বা একটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো সহজতর করার জন্য অর্থনীতি নয়, বরং যা ব্যক্তির প্রয়োজন মেটায় তা বৃদ্ধির দিকে এটি কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্প্রদায়ের প্রয়োজন পূরণ করাই এর লক্ষ্য। মালিকানা লাভ করা ও কাজ করার স্বাধীনতার দ্বারা জাতীয় আয়ের সুপ্রাপ্যতার মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের মধ্যে আয়ের বন্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদ অর্জন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির উৎপাদনের সামর্থ অনুসারে এটি তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে – হোক এর মাধ্যমে সব ব্যক্তি কিংবা কেবল কিছু ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে।

এটি হল রাজনৈতিক অর্থনীতি অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এটি একটি প্রকাশ্য ভ্রান্তি এবং বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। এটি সব ব্যক্তির জীবনমান উন্নত করার জন্য কাজ করে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক কল্যাণ নিশ্চিত করে না। এ দৃষ্টিভঙ্গির ভুল দিকটি হল যে, যেসব প্রয়োজন মেটানোর কথা বলা হয় সেগুলো হল ব্যক্তির প্রয়োজন। এগুলো হল মানুষের প্রয়োজন। সুতরাং এগুলো হল মুহাম্মদ, সালিহ ও হাসানের প্রয়োজন, এ প্রয়োজন কোন ব্যক্তি সমষ্টি, কিছু জাতির বা একটি জনসমষ্টির নয়। সুতরাং ব্যক্তি নিজেই তার প্রয়োজন পূরণের জন্য কাজ করবে – হোক সে এটি সরাসরি পূরণ করে, যেমন: খাওয়া দাওয়া অথবা সে পুরো জনসমষ্টির চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে এটি করে থাকে, যেমন: একটি জাতির প্রতিরক্ষা। সুতরাং ব্যক্তির প্রয়োজন

পূরণের উপকরণ বন্টনের মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা নিহিত রয়েছে অর্থাৎ জাতির মধ্যে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বিবেচনা না করে জাতি বা লোকদের যা প্রয়োজন তা পূরণ করার মধ্যে নয়, বরং জাতির সদস্য ও লোকদের কাছে তহবিল ও উপযোগ বন্টন করার মধ্যে। অন্য কথায় সমস্যা হল ব্যক্তির দরিদ্রতা কিন্তু জাতির নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল বিষয় হতে হবে, কখনই অর্থনৈতিক পণ্য উৎপাদনের আলোচনা করা নয়।

ফলে জাতীয় উৎপাদনের আকারকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামকসমূহের অধ্যয়ন অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা আলাদাভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অধ্যয়ন থেকে আলাদা। একজন ব্যক্তির সব মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদের বন্টনের আলোচনা অধ্যয়নের বিষয় হতে হবে। এটিই গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত এবং প্রথম থেকেই এটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাছাড়া একটি দেশের দরিদ্রতা বিমোচনের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে একজন ব্যক্তির দরিদ্রতা নিরসন করে না। বরং ব্যক্তির দরিদ্রতা নিরসনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং পদক্ষেপগুলোর মধ্যে দেশের সম্পদ বন্টনের কর্মসূচী দেশের লোকদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। উৎপাদনের পরিমাণ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামকসমূহের গবেষণা অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে আলোচনা করা উচিত অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণের আলোচনায় নয় বরং অর্থনৈতিক পণ্য এবং এর বৃদ্ধির আলোচনায় এটি স্থান পাবে। কেননা প্রয়োজন পূরণের বিষয়টি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আলোচিত হবে।

পুঁজিবাদীরা দাবি করে যে কোন একটি সমাজ অর্থনৈতিকভাবে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হল পণ্য ও সেবার অভাব। তারা আরও দাবি করে যে, চাহিদা অবিরতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে এবং এগুলোকে পূরণ করার অক্ষমতা অর্থাৎ মানুষের সব প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণ করার জন্য পণ্য ও সেবার অপর্যাপ্ততাই হল অর্থনৈতিক সমস্যার ভিত্তি। এ দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিপূর্ণ ও বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। এর কারণ হল একজন মানুষের ব্যক্তি হিসেবে তার মৌলিক প্রয়োজন (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) পূরণ হতে হবে, কিন্তু বিলাস সামগ্রী নয় – যদিও এগুলোও মানুষ চায়। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন সীমিত এবং পৃথিবীতে বর্তমান যেসব সম্পদ ও প্রচেষ্টাকে তারা পণ্য ও সেবা হিসেবে অভিহিত করে থাকে সেসব অবশ্যই সব মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য পর্যাপ্ত, মানবজাতির সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব। মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা নিয়ে কোন সমস্যা নেই যদি না সেটিকে সমাজের জন্য অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তবে অর্থনৈতিক সমস্যা হল ব্যক্তির সব মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এইসব সম্পদ ও প্রচেষ্টাসমূহের বন্টন এবং এরপর তাদেরকে বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে সাহায্য করা।

অবিরতভাবে প্রয়োজন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলা যায় এটি মৌলিক প্রয়োজন বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নয়। কারণ মানুষ হিসেবে কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন বাড়ে না। অন্যদিকে বিলাস সামগ্রীর চাহিদা বাড়ে ও পরিবর্তিত হয়। শহুরে জীবনে উন্নতির সাথে চাহিদার বৃদ্ধি মৌলিক প্রয়োজনের সাথে বিজড়িত নয় বরং বিলাস সামগ্রীর সাথে জড়িত। মানুষ বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য কাজ করে, কিন্তু এগুলো পূরণ না হলে সমস্যার সৃষ্টি হয় না। যা সমস্যার সৃষ্টি করে তা হল মৌলিক অধিকার পূরণ না হওয়া। এসব কিছুর পাশাপাশি বিলাস সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির প্রশ্নটি কেবলমাত্র কিছু লোকের সাথে জড়িত যারা একটি নির্দিষ্ট দেশে বাস করে এবং এ প্রশ্নটি দেশের সব ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নয়। মানুষের মধ্যে প্রয়োজন পূরণের স্বাভাবিক প্রবণতার মাধ্যমে এ প্রশ্নটির সমাধান হয়। বিলাস সামগ্রী অর্জনের প্রবল আকাঙ্খার ফলে মানুষ তার দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে, অন্য দেশে কাজ করে অথবা অন্য দেশের সাথে একীভূতকরণ বা প্রসারণের মাধ্যমে এগুলো পূরণের জন্য ধাবিত হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণের ইস্যুটির চেয়ে এটি আলাদা। এর কারণ হল প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা ও বিলাস সামগ্রীর চাহিদা পূরণ করার জন্য সম্পদ বন্টন করার সমস্যাটি জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কযুক্ত যা বিশেষ আদর্শ বহনকারী কোন বিশেষ জাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, বিদেশ গমন, রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধন অথবা অন্য দেশের সাথে একীভূত হওয়া ইত্যাদি জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করে। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ বা জাতির সম্পর্কিত নয়, বরং তা বাস্তবভিত্তিক সমাধানের উপর নির্ভরশীল।

...সুতরাং এমন অর্থনৈতিক মূলনীতি প্রণয়ন করতে হবে যেগুলো জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পদের বন্টন নিশ্চিত করবে – যাতে করে প্রত্যেকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় এবং অতঃপর প্রত্যেককে বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান করে তোলা যায়...

সুতরাং এমন অর্থনৈতিক মূলনীতি প্রণয়ন করতে হবে যেগুলো জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পদের বন্টন নিশ্চিত করবে – যাতে করে প্রত্যেকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় এবং অতঃপর প্রত্যেককে বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান করে তোলা যায়। তবে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর আলোচনা অর্থনৈতিক সমস্যাটির সমাধান করে না – যা হল প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করা। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি দেশের সম্পদ বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায় কিন্তু কার্যকরভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করে না। দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারে, যেমন: ইরাক ও সৌদি আরব, কিন্তু তাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়নি। সুতরাং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি প্রত্যেক ব্যক্তির সবার আগে ও সর্বপ্রথম বিবেচনা করতে হয় এমন মৌলিক সমস্যার সমাধান করে না অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণ করা ও অতঃপর তাদেরকে বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান করে তোলার সাথে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক নেই। সুতরাং দরিদ্রতা ও বঞ্চনা মানুষ হিসেবে মৌলিক অধিকার পূরণ না হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে, কিন্তু কখনই নগরায়নের কারণে ক্রমবর্ধমান বিলাস সামগ্রীর চাহিদার কারণে নয়। সুতরাং সমাজের প্রত্যেকের দরিদ্রতা ও বঞ্চনাকেই বঞ্চনা সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে হিসেব করা দেশের দরিদ্রতা বঞ্চনা সমস্যা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির দরিদ্রতা ও বঞ্চনা বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমবর্ধমান জাতীয় আয় বৃদ্ধি দ্বারা নিরূপিত হয় না, বরং এটিকে এমনভাবে বিবেচনা করা হয় যাতে মৌলিক অধিকার পুরোপুরি পূরণ করার জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ বন্টিত হয় এবং তারপর প্রত্যেককে বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান করে তোলা যায়।

চলবে...

বই অনুবাদ : গত সংখ্যার পর থেকে

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

লেখক: হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিষ্ঠাতা
শাইখ তাক্বি উদ্দীন আন-নাবাহানি

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

আমরা যদি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে এর দৃষ্টিভঙ্গি হল এটি মানুষের প্রয়োজন (needs) এবং এসব প্রয়োজন পূরণের উপকরণ নিয়ে কাজ করে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের কেবলমাত্র বস্তুগত দিকটি নিয়েই আলোচনা করে এবং এটি তিনটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

- প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবার আপেক্ষিক অভাব (relative scarcity) রয়েছে। এর অর্থ হল মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন পূরণের জন্য পণ্য ও সেবার অপর্যাপ্ততা। তাদের দৃষ্টিতে এটাই হল সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা।
- অধিকাংশ অর্থনৈতিক গবেষণা ও অধ্যয়নের ভিত্তি হল উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (value)।
- উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনে দামের (price) ভূমিকা। দাম হল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি মৌলিক বিষয়।

পণ্য ও সেবার আপেক্ষিক অভাবের ক্ষেত্রে বলা যায়, পণ্য ও সেবা মানুষের অভাব পূরণের উপকরণ হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারা বলে মানুষের প্রয়োজন রয়েছে যা পূরণ করতে হয় এবং এ প্রয়োজন পূরণের উপকরণ থাকতেই হবে। এ প্রয়োজনসমূহ পুরোপুরিই বস্তুগত (materialistic)। এগুলো হয় দৃশ্যমান (tangible), যেমন: খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজন, অথবা এমন সব প্রয়োজন যা মানুষ অনুভব করে এবং এগুলো অদৃশ্যমান (intangible) অর্থাৎ সেবার প্রয়োজন, যেমন: ডাক্তার বা শিক্ষকের সেবা। নৈতিক প্রয়োজন, যেমন: গৌরব ও সম্মান অথবা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, যেমন: স্রষ্টার উপাসনা করা, এগুলো অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃত নয়। একারণে এগুলো পরিত্যাগ করা হয়, ফলে অর্থনৈতিক আলোচনায় এগুলোর কোন স্থান নেই।

প্রয়োজন পূরণের উপকরণসমূহকে পণ্য ও সেবা বলা হয়। পণ্য হল দৃশ্যমান প্রয়োজন পূরণের উপকরণ এবং সেবা হল অদৃশ্যমান প্রয়োজন পূরণের উপকরণ। তাদের দৃষ্টিতে যা পণ্য ও সেবাকে প্রয়োজন পূরণ করতে দেয়, তা হল পণ্য ও সেবার মধ্যে থাকা সুযোগ-সুবিধা বা উপযোগ। এই উপযোগ এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা প্রয়োজন পূরণের জন্য আকাঙ্খিত বস্তু থেকে পাওয়া যায়। যেহেতু প্রয়োজন হল অর্থনৈতিক আকাঙ্খা, সেহেতু আকাঙ্খিত প্রতিটি বস্তুই অর্থনৈতিকভাবে উপকারী – হোক তা অপরিহার্য বা তা নয়, কিংবা কিছু সংখ্যক লোক এটিকে উপকারী মনে করুক এবং অন্য কিছু সংখ্যক এটিকে ক্ষতিকর মনে করুক। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে উপকারী যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ একে আকাঙ্খিত মনে করে। যেকোন বস্তুকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কিনা শুধুমাত্র সে দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয়, যদিও বা জনমত এটিকে অলাভজনক বা ক্ষতিকারক মনে করে। সেকারণে মদ ও হাসিস অর্থনীতিবিদদের কাছে লাভজনক, কেননা কিছু লোক এগুলো চায়।

অন্য কোন বাস্তবতা বিবেচনায় না এনে কেবলমাত্র প্রয়োজন পূরণ করে – এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনীতিবিদ প্রয়োজন পূরণের উপকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অর্থাৎ পণ্য ও সেবার দিকে লক্ষ্য করে। সুতরাং সে প্রয়োজন ও উপযোগ এ দু'টি যেরূপ বিদ্যমান ঠিক সেভাবেই দেখে, কিন্তু এগুলো কিরকম হওয়া উচিত সেদিকে দৃষ্টিপাত করেনা অর্থাৎ সে অন্য কোন কিছুকে বিবেচনায় না এনে উপযোগকে প্রয়োজন পূরণের নিয়ামক হিসেবে দেখে। সুতরাং কিছু লোকের চাহিদা মেটানোর কারণে সে মদকে অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করে এবং অর্থনৈতিক মূল্য বিবেচনা করে মদ প্রস্তুতকারীকে একজন সেবাপ্রদানকারী হিসেবে মনে করে। কারণ এটি কিছু ব্যক্তির অভাব পূরণ করে।

এটিই হল পুঁজিবাদে প্রয়োজন ও তা পূরণের উপকরণের প্রকৃতি। সেকারণে অর্থনীতিবিদ সমাজের প্রকৃতির তোয়াক্কা করে না, কিন্তু তারা অর্থনৈতিক বস্তুগত সম্পদ বা অর্থনৈতিক পণ্যের ব্যাপারে যত্নশীল কারণ এগুলো প্রয়োজন পূরণ করে। সুতরাং তাদের মতানুসারে অন্য কোন কিছু বিবেচনায় না এনে মানুষের প্রয়োজন পূরণের উপকরণ যোগানের জন্য পণ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। অর্থাৎ, প্রয়োজন পূরণের উপকরণ সরবরাহ করা দরকার। প্রয়োজন পূরণের উপকরণ হিসেবে পণ্য ও সেবা যেহেতু সীমিত সেহেতু এগুলো মানুষের সব প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত নয়। কারণ তাদের দৃষ্টিতে এই প্রয়োজনসমূহ অসীম এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি একারণে যে, মানুষের রয়েছে এমন কিছু মৌলিক প্রয়োজন যা তাকে পূরণ করতেই হয় এবং এমন কিছু প্রয়োজন রয়েছে যা নগরায়নের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। এ চাহিদাসমূহ গুনিতক হারে বাড়তেই থাকে এবং এগুলো পুরোপুরি পূরণ করা দরকার। যদিও পণ্য ও সেবা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, এগুলো কখনই পূরণ হবার নয়। এ ভিত্তি থেকে অর্থনৈতিক সমস্যার সূত্রপাত হয়, যা হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত বোঝা এবং এগুলো পূরণের জন্য উপকরণের অপ্রতুলতা অর্থাৎ মানুষের সব অভাব পূরণের জন্য পণ্য ও সেবার অপ্রতুলতা।

এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ একটি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তা হল পণ্য ও সেবার আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা। এ দুষ্প্রাপ্যতার অপরিহার্য ফল হল কিছু প্রয়োজন আংশিকভাবে পূরণ হয় এবং কিছু কখনই পূরণ হয় না। যেহেতু এটাই হল অবস্থা সেহেতু এটি অপরিহার্য যে সমাজের সদস্যগণ এমন আইনের ব্যাপারে একমত হবেন – যা নির্ধারণ করবে কোন প্রয়োজনগুলো পূরণ হওয়া উচিত এবং কোনগুলো নয়। অন্যকথায় এমন আইন প্রণয়ন করা জরুরী যা অসীম অভাব পূরণ করার জন্য সীমিত

...১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

“তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।” [সূরা আন-নূর : ৫৫]

“তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ্ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্’র ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়্যতের আদলে।” *(মুসনাদে আহমদ, খন্ড ৪, হাদীস নং-১৮৫৯৬)*